KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : অগ্রিম	Size : 6"x 9.5" 15.24 X 24.13 c.m.
Vol. & Number : 2/1 2/2 2/3-4 2/5	Year of Publication : আশ্বিন, ১৩৮৭ কার্তিক, ১৩৮৭ অগ্রহায়ণ, পৌষ - ১৩৮৭ মাঘ, ১৩৮৭
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, বিজনরায় চৌধুরী	Remarks : No. of Page missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পত্রিকা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা   কার্ত্তিক, ১৩৪৭

জড়-বিশ্বে মানুষের স্থান

সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঝড়জগৎ ও মনোজগৎ—Objective এবং Subjective world—জগতের এই বিভাগ দু'টিকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ চিরদিনই দু'টি স্পষ্ট বিভাগ রূপে স্বীকার ক'রে এসেছেন। ওদের মধ্যে প্রাধান্য দিতে হবে কোন্ জগৎকে তা নিয়েও, দেশভেদে ও কালভেদে, মতভেদ ঘ'টে আসছে। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের বেদান্তের যুগ থেকেই একটা সুনাম বা-দুর্ণাম আছে এই যে, বাহ্যজগৎটাকে তাঁরা দেখে থাকেন, মোটের উপর, তুচ্ছের দৃষ্টিতে। জড়-বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের বিমুখতার মূল কারণও হয়ত তা-ই।

কারণ যা-ই হোক, বিজ্ঞানের আবহাওয়া আমাদের দেশে বইবার সুযোগ পায়নি মোটেই। কতকটা জোর ক'রেই আমরা ওর স্বাভাবিক প্রবাহকে রোধ ক'রে রেখেছি—যদিও জীবন-সংগ্রামে টিঁকে থাকতে হ'লে ওর নিঃশ্বাস গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তরও নেই। ফলে, অন্নসংগ্রহের প্রতিযোগিতায় ক্রমে হটে' গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে আমরা বাধ্য হচ্চি। বাইরের থেকে এর কোনো প্রতিকার হ'তে পারেনা। যারা বলে "I shall die" তাদের রক্ষার জন্য কেউ ছুটে আসে না। আমাদের জন্যও কেউ আসবে না।

অন্য পক্ষে, পাশ্চাত্ত্য দেশ সমূহ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পেরেছে জড় বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হয়ে এবং জড় ও জড়-শক্তির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে। তাঁরা জড়প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে প্রকৃতির ধনভাণ্ডারের ওপর স্বাভাবিক দাবি প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। আমরা বন্ধুত্ব করছিনে কিন্তু তার প্রতিদানটার জন্য হাত বাড়াচ্ছি তাঁদের মতই। আমাদের গোড়ায় গলদ ঐখানে।

সে যা হোক, পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছিল মধ্যযুগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও ওর প্রভাব অক্ষুণ্ণই ছিল। বিংশ শতাব্দী পড়তে

না পড়তে, বিশেষভাবে আপেক্ষিকতাবাদের কল্যাণে, বিজ্ঞান-জগতের ঐ বিশিষ্ট মনোবৃত্তিটা সহসা বাধা প্রাপ্ত হ'ল, এমন কি ওর গতির দিক অনেকটা উল্টে গেল। জড়ের অনশ্বরতার দাবি শিথিল হয়ে গেল। একটা জড়দ্রব্যকে অন্য একটায় পরিণত হ'তে দেখা গেল, এমন কি জড়ের শক্তি-মূর্ত্তি গ্রহণও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ব'লে প্রতিপন্ন হ'ল। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জড় তা'র অস্তিত্বের ঘনত্ব হারিয়েছে। কবির ভাষায়—ধূপ যেন বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে নিছক গন্ধে। জড়জগতের অস্তিত্ব লোপ পায়নি কিন্তু ক্রমেই ও টেনে নিয়ে চলেছে ওর দ্রষ্টাগণকে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনির্ব্বচনীয়তার ভেতর দিয়ে।

ফলে, বাহ্যজগৎ বা Objective world-এর মূর্ত্তিটা, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, ক্রমে মনোজগৎ বা Subjective world-এর অরূপ রূপে পরিবর্ত্তিত হ'তে চলেছে। পরিবর্ত্তনের শেষ সীমা কুয়াশাচ্ছন্ন কিন্তু ঐ দিকে লক্ষ্য ক'রেই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কাঠামোগুলো নিজেদের নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলবার প্রয়াসী হয়েছে এবং ওর দিকে লক্ষ্য ক'রেই নূতন নূতন গণিতের আবির্ভাব ও প্রসার ক্রমে বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেকথা স্বতন্ত্র—আমাদের অজ্ঞতার গভীরতা অন্ধকারের গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তিতেই চির-সমুজ্জ্বল থাকবে সন্দেহ নেই।

বস্তুতঃ, ঐ পরিবর্ত্তন সম্ভব হ'তে পেরেছে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সত্যিকারের অধিকারের আবিষ্কার ও-প্রতিষ্ঠা দ্বারা। এতদিন মানুষ মনে ক'রে আস্‌ছিল যে, দেশ এবং কালকে স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ সত্তারূপে গ্রহণ ক'রে তারা যে সকল বিজ্ঞানের সূত্র রচনা ক'রে এসেছে ঐগুলি নিশ্চয়ই অভ্রান্ত সত্য। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রচার করলো যে, সকলের দেশ ব'লে একটা বিশিষ্ট দেশ (Space) নেই, সকলের কাল ব'লে একটা বিশিষ্ট কালপ্রবাহও নেই। দ্রষ্টাভেদে, দ্রষ্টার জগৎভেদে, —ঐ সকল জগতের আপেক্ষিক গতির ফলে—আমাদের দেশ-বুদ্ধি ও কাল-বুদ্ধি বদ্‌লে যায়। সুতরাং দেশ ও কালকে দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ খাঁটি সত্য রূপে গ্রহণ ক'রে এ যাবৎ প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহের যে সকল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং যে সকল সূত্র বা সম্বন্ধগুলিকে খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম ব'লে দাবি করা হয়েছে তাদের সকলেরই সংশোধনের প্রয়োজন। বস্তুতঃ আধুনিক বিজ্ঞান, সমগ্র বিজ্ঞানশাস্ত্রকে নূতন ক'রে ঢেলে সাজবার কার্য্যে নিযুক্ত রয়েছে।

ফলে নব্য বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠেছে দেশ ও কাল সম্পর্কে বিভিন্ন দ্রষ্টার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে—যে দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর কচ্ছে ঐ সকল দ্রষ্টাগণ—বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অধিবাসিগণ—কি বেগে পরস্পরের সম্পর্কে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে তা'র ওপর।

প্রকৃতির বিধানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন জগতের অধিবাসী এবং ঐ সকল জগৎ, যা'র যা'র অধিবাসীদের নিয়ে, পরস্পর-সম্পর্কে ছুটোছুটি করছে; ফলে আমরাও—ঐ সকল জগতের দ্রষ্টাগণ—পরস্পর-সম্পর্কে ছুটোছুটি কত্তে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের এই সকল আপেক্ষিক বেগই নিয়মিত কচ্ছে আমাদের দেশ-বুদ্ধি ও কাল-বুদ্ধি। আপেক্ষিক বেগের ফলে আমাদের দেশ ও কালের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে এবং ওদের বিভিন্নতার মাত্রাও নিয়মিত হচ্ছে আমাদের পরস্পরের আপেক্ষিক বেগের মাত্রা দ্বারাই।

এইরূপে আধুনিক বিজ্ঞান, বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণকে দেশ এবং কালের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত ক'রে, উভয়ের মূর্ত্তিকেই দ্রষ্টাগণের আপেক্ষিক-বেগ-সাপেক্ষ রূপে দাঁড় করিয়েছে। এতদিন আমরা চেলছি দেশ ও কালের মুখ তাকিয়ে—ওদের বিরাট সত্তা স্বীকার ক'রে এবং ঐ সত্তায় সার্ব্বভৌমিকত্ব দান ক'রে; বর্ত্তমানে দেশ ও কাল চল্‌ছে আমাদের মুখ তাকিয়ে—আমরা যে আপেক্ষিক-বেগসম্পন্ন বিভিন্ন জগতের অধিবাসী এইটা মেনে নিয়ে—আমাদের পারস্পরিক বেগ-মাহাত্ম্য স্বীকার ক'রে।

কেন এই বেগ-মাহাত্ম্য স্বীকার—দেশ এবং কালের আমাদের মুখ চেয়ে চলা? কোন্ গভীর বা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে এর পশ্চাতে? এ-সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তর কতকটা এইরূপ:

'এক আমি বহু হব' এই হ'ল গোড়ার কথা। ফলে অসংখ্য জগৎ—অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা। এই বহুত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে একত্বের বীজ—প্রেমের বন্ধন। তাই পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েও জড়খণ্ডগুলি পরস্পরের প্রতি ধাবমান—পরস্পর-সম্পর্কে বেগসম্পন্ন। সুতরাং আমরাও—ঐ সকল জগতের অধিবাসিগণ—আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন হয়ে পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এইরূপে আমাদের ভিতর একটা জন্মগত বৈষম্য এসে পড়েছে যা' প্রকৃতির বিধান এবং যা' এড়িয়ে চলবার আমাদের কোন উপায়ই নেই। এই বৈষম্যের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, দেশ ও কালের পরিমাপে আমরা পরস্পরের সঙ্গে একমত হ'তে পাচ্ছিনে—দেশ ও কাল আমাদের কাছে প্রকটিত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তি নিয়ে বা ভিন্ন ভিন্ন আকার নিয়ে। এ যাবৎ আমরা এইরূপই ভেবে এসেছি যে, আমার বয়সের পরিমাণটা, তোমার-আমার মাপকাঠিতে যা' হবে অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রের অধিবাসীর পরিমাপেও তাই দাঁড়াবে, কিন্তু সে-ধারণা ভুল।

বস্তুতঃ, তা'তে কিছু যায় আসে না। দেশ বা কাল আমাদের পক্ষে এমন কিছু মূল্যবান পদার্থ বা বিষয় নয় যে, ওদের সম্বন্ধে একমত না হ'তে পারলে আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের দ্রষ্টা রূপে আমাদের কাছে খাঁটি পদার্থ বা

সার সত্য হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি। ঐ সকল নিয়ম আমাদের কাছে একই আকারে উপস্থিত হবে প্রকৃতি দেবীর এই-ই অভিপ্রায়। ইহাই আমাদের প্রতি প্রকৃতির করুণা। এই করুণালাভে আমাদের সকলের সমান অধিকার এবং এই অধিকারের বলেই আমরা পরস্পরে ভাই ভাই। আইন্‌ষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মূল কথা এই-ই—বিজ্ঞান-জগতে এই সাম্যবাদের প্রচার—দ্রষ্টার সঙ্গে দ্রষ্টার এই ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। মানুষের সাথে মানুষের সত্যিকারের সম্বন্ধ ওই-ই এবং ওর প্রতিষ্ঠাতেই নিহিত রয়েছে ঐ মতবাদের প্রকৃত গৌরব।

খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে আমাদের সকলের কাছে একই আকারে উপস্থিত হ'তে হবে, আপেক্ষিকতাবাদের মতে খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের ইহাই লক্ষণ। খাঁটি নিয়মের এই সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দান ক'রে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান খাঁটি সত্যের আবিষ্কারে পথপ্রদর্শক হয়েছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যিকারের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ কত্তে পেরেছে ব'লে দাবী জানাচ্ছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন্‌ষ্টাইন্ প্রচার করলেন যে, আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণের কাছে (ঐ সকল বেগ যদি সমবেগ হয়) আলোকের বেগ সমান ব'লে প্রতিপন্ন হ'তে হবে—সকল জগতের দ্রষ্টার মাপেই ঐ বেগের মাত্রা ধরা পড়বে "সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ" রূপে। এর অর্থ, আলোকরশ্মির যাত্রাপথকে তার যাত্রাকাল দিয়ে ভাগ করলে সকল দ্রষ্টাই দেখতে পাবে যে, ঐ ভাগফলটা একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি। আইন্‌ষ্টাইন্ বললেন, আলোকের বেগের এই দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা, ঐ সকল জগতের পক্ষে, একটা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম। তিনি আরো বললেন, খাঁটি নিয়ম মাত্রের লক্ষণই হ'ল ঐ—দ্রষ্টাগণ পরস্পর-সম্পর্কে স্থিরই থাকুক অথবা যে কোন বেগে ছুটেই চলুক, খাঁটি নিয়মকে, তাদের সকলের কাছে একই মূর্ত্তিতে বা একই বিশিষ্ট সম্বন্ধের আকারে উপস্থিত হ'তে হবে।* এইরূপে জড়জগতে দ্রষ্টার মাহাত্ম্য বেড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও কালের মাহাত্ম্য কমে' গেল। কমে' গেল, কারণ যার যার জগৎ থেকে দূরত্ব ও কালের পরিমাপ ক'রে দ্রষ্টাগণ যদি দেখতে পায় যে, তাদের আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও, আলোক-রশ্মির যাত্রাপথের ও যাত্রাকালের অনুপাতটা তাদের সকলের কাছে সমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে তবে তারা এ-ও দেখতে বাধ্য হবে যে, ঐ দৈর্ঘ্য এবং ঐ কালের পরিমাণ তাদের মাপে সমান হ'তে পারেনি এবং পারেনি, তারা সিদ্ধান্ত করবে,

* আইনষ্টাইনের এই অনুমান বা hypothesisটাই আপেক্ষিকতাবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই অনুমানের মূলে রয়েছে একটা পরীক্ষালব্ধ সত্য—মাইকেলসনের নিষ্ফল পরীক্ষা। আলোকের বেগকে ভিত্তি ক'রে মাইকেলসন্ মহাশূন্যে পৃথিবীর বেগ নিরূপণে অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু পরীক্ষা ব্যর্থ হলো। এই ব্যর্থতার সঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন আইন্‌ষ্টাইন্—আলোকের উক্ত বেগ-মাহাত্ম্য অঙ্গীকার ক'রে।

তাদের আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও, আলোকের বেগ সকলের দৃষ্টিতে সমান হ'তে হবে—আলোকের এই বেগ-মাহাত্ম্য এবং দ্রষ্টার এই দৃষ্টি-মাহাত্ম্য বিশিষ্ট প্রয়োজন রূপে উপস্থিত হচ্ছে ব'লে।

বৈষম্যের অন্তরালে সাম্য এবং সেই সাম্য গ'ড়ে উঠেছে মানুষের মুখ তাকিয়ে—দেশ, কাল বা জড়ের মুখ তাকিয়ে নয়—বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এই-ই শিক্ষা এবং এই শিক্ষাই দান করেছে মানবচিত্তে নূতন প্রেরণা—বিশ্ব মানবতার নূতন অনুভূতি। সাবেক যুগের জড়বাদ শিক্ষা দিয়েছে ঐ বাহ্যজগৎটা অন্তর্জগৎ হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ঐ জগৎ আমাদের মুখ তাকিয়ে চলেনা, আমাদের সম্পর্কে ওর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাব। প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের আমরা নির্ব্বাক দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। জড়জগৎকে আমরা সম্মান করি, ঐ সকল নিয়মকে আমাদের প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগাতে পাচ্ছি ব'লে, কিন্তু ওদের রচনার পেছনে যে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা' লক্ষ্য ক'রে চলেছে যে আমাদের কোন সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাবার দিকে এমন দাবি আমাদের নেই। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের শিক্ষা এই যে, ঐ দাবি আমাদের রয়েছে এবং ঐ প্রয়োজন মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা।

জাগতিক ঘটনা সমূহ ঠিকমত পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ওরা অগ্রসর হয়েছে জড়জগতের বিভিন্ন সম্বন্ধগুলিকে—প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে—ওদের দ্রষ্টাগণের নয়ন সমক্ষে একই মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুলবে এই উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কেবল ঘটবে ব'লেই ওরা ঘটছে না। ওরা ঘটছে কেউ দেখবে ব'লে—দেখবে, মাপজোখ করবে এবং ঐ পরিমাপের ফলগুলির মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে এবং খাঁটি নিয়মের কষ্টিপাথরে ওদের যাচাই ক'রে নিয়ে ঐ সকল নিয়ম আবিষ্কার করবে ব'লে। দ্রষ্টা বলতে এঁদেরই বোঝায় এবং বিজ্ঞান-জগতে খাঁটি মানুষ বলতেও এঁদেরই বোঝায়।

কেন করবে তা'রা ঐ সকল নিয়মের আবিষ্কার?—কারণ জন্মগত অবস্থা-বৈষম্য সত্ত্বেও বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণ নিজেদেরকে প্রকৃতি-মাতার খাঁটি সন্তান ব'লে অনুভব করতে চায়, তাদের সকলের ধমনীতে যে একই শোনিত প্রবাহিত এর দৃঢ় প্রতীতি নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হ'তে চায় এবং জড়-বিশ্বের সকল প্রান্ত হ'তে ঐ সুরেরই প্রতিধ্বনি শুনতে চায়—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

গৃহিণী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দরজা খুলিয়া রসিককে দেখিয়া শান্তি বলিল, 'ও, আপনি!' তারপর সোজা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অভ্যর্থনাটা একটু খাপছাড়া মনে হইল রসিকের। তাকে দেখিলেই অবশ্য শান্তির মুখ গম্ভীর হইয়া যায়, চৌকাঠ ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিবার আগেই ঝাঁঝালো সুরে রাগ আর বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়, এরকম নির্ব্বিকার ভাবে কখনো সরিয়া যায় না। তবে কি বিপিন আজ বাড়ীতে আছে? কিন্তু বিপিন বাড়ী থাকিলে তো শান্তি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়, বলে, 'আসুন, উনি ঘরে আছেন।' বলিয়া দরজা বন্ধ করার জন্য নিজেই দাঁড়াইয়া থাকে।

মাঝে মাঝে রসিকের মনে হইয়াছে, হাসিটা বুঝি ব্যঙ্গের। সেদিন সে আর শান্তির আঙুলের ডগাটিও স্পর্শ করিতে পাইবে না, অসময়ে হঠাৎ আসিয়া হাজির হওয়ার জন্য লাগসই একটা কৈফিয়ৎ দিয়া বসিয়া বসিয়া বিপিনের সঙ্গে গল্পগুজব করিতে হইবে, শান্তি চা আনিয়া দিলে সহজ স্বাভাবিক ভাবে তার সঙ্গেও কথা বলিতে হইবে, উঠিয়া যাওয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে ছটফট করিতে থাকিলেও তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাওয়া চলিবে না, এই সব ভাবিয়া শান্তি বুঝি আমোদ পাইতেছে। তবে এটাও রসিক টের পাইয়াছে, আমোদের চেয়ে রসিককে সতর্ক করিয়া দেওয়ার ব্যগ্রতা অনেক বেশী জোরালো। বিপিন যে বাড়ী আছে, সদরের এই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একটা খাপছাড়া কথা বলিয়া ফেলিলে ঘরে বিপিনের কানে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সকলের আগে এটা রসিককে জানাইয়া দেওয়া চাই। শান্তির অভ্যর্থনার আসল অর্থ তাই।

একবার রসিক বলিয়াছিল, 'এখান থেকেই তবে সরে' পড়ি?'

শান্তির দু'চোখ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, 'সরে' পড়বেন? কি বুদ্ধি!'

তাই বটে। দরজার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া, দরজা খোলাইয়া চলিয়া যাওয়ার কোন অর্থ হয় না বটে। আর অর্থহীন কাজই মানুষের মনে নানারকম সন্দেহ জাগায়। নয়তো হঠাৎ আসিবার লাগসই কারণ বিপিনকে দেখানোর কি প্রয়োজন থাকিত?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া আরও একটু ইতস্ততঃ করিয়া রসিক ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ততক্ষণে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে।

'দরজা দিলেন যে?'

প্রতিবার শান্তি এই প্রশ্ন করে। শান্তির অভ্যর্থনার পুরানো সূচনায় স্বস্তি বোধ করিয়া রসিক বলিল, 'চলুন ঘরে গিয়ে বসি।'

'বসতে পারব না। কাজ আছে।'

'কি কাজ? ঘুমোবেন?'

'খোকাকে দুধ খাওয়াবো।' একবার ঢোক গিলিয়াই শান্তি আবার বলিল, 'আপনাকে না আসতে বারণ করেছি? আপনি না বলে' গেলেন আর আসবেন না? কেন মরতে এসেছেন আবার?'

এই তো চাই, এভাবে কথা না বলিলে শান্তিকে যেন অচেনা মনে হয়।

'একটু দরকারে এসেছি।'

'আপনার দরকার জানি। ইতর কোথাকার!'

এতক্ষণে শান্তি ধাতে আসিয়াছে। রসিক নিশ্চিন্ত হইয়া সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল। রোদে রোদে ঘুরিয়া মুখের চামড়া মুহূর্তে আঁচে সেঁকা কাগজের মত হইয়া গিয়াছে।

'আচ্ছা, কি দরকার বলুন। বলে' বেরিয়ে যান।'

নিশ্চিন্ত হইতে পারায় এবার রসিক সহজে রাগও করিতে পারিল।

'এরকম করছেন কেন? জানেন তো এসেছি যখন, কিছুতেই ফিরে যাব না। আমি যা ধরি তা ছাড়ি না। তা' ছাড়া—'

বলিতে বলিতে শান্তিকে দেখিতে হইতেছিল, তাই কথা শেষ হওয়ার আগেই রসিকের রাগ কমিয়া গেল। দু'হাত শক্ত করিয়া মুঠি করিয়া টান হইয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। উদ্দেশ্য, সমস্ত শরীরটা কাঠের মত শক্ত করিয়া মনের রাগটা প্রকাশ করা। কিন্তু রূপ যার শুধু কোমলতার ঢেউ, সে তা পারিবে কেন? সেমিজ পরা থাকিলে তবু কতকটা সম্ভব হইত। বিপিন বাড়ী না থাকিলে শান্তি সেমিজ পরে না। একা থাকার স্বাধীনতাটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা চাই তো?

প্রতিবার চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাড়ীর ভিতরে আসিবার পর শান্তিকে দেখিয়া উদাসীনতা অবহেলার একটা ঝাপসা কুয়াসার পর্দ্দা যেন চোখ বা মন হইতে সরিয়া যায়। শান্তি যে এরকম তা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। ভাঙাচোরা কাঁচের পুতুলের মত শান্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কেবল সামনে দাঁড়াইয়া চোখে দেখার ম্যাজিকে টুকরাগুলি জোড়া লাগিয়া একেবারে রক্তমাংসের মানুষ হইয়া গিয়াছে।

গলা নরম করিয়া আদরের সুরে রসিক বলিল, 'রাগ করো না। না এসে থাকতে পারলে কি আসতাম? কাল তোমায় স্বপ্ন দেখলাম—'

শান্তির মুঠি আলগা হইয়া গেল।—'স্বপ্ন দেখেছ? আমায়?'

কথাটা মিথ্যা, কিন্তু শান্তির টান-করা শরীর বেশ খানিকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া রসিক মিথ্যারই জের টানিয়া চলিল, 'তবে আর কাকে স্বপ্ন দেখব? কার কথা সারাদিন ভাবি? তুমি তো কাউকে কোনদিন ভালবাসো নি, তাই বুঝতে পার না, যদি ভালবাসতে তাহ'লে বুঝতে পারতে ভালবাসলে মানুষের কি অবস্থা হয়।'

শান্তির মুঠি আবার শক্ত হইয়া গেল।—'লজ্জা করে না এ-সব কথা বলতে? ছোটলোক, অভদ্র, জানোয়ার। আপনি যান, আর আসবেন না। আবার এলে আপনাকে খুন করে' আমি আত্মহত্যা করব।'

তখন আর তর্ক না করিয়া শান্তির হাত ধরিয়া ঘরের দিকে আগাইয়া গেল। শান্তি বিনা প্রতিবাদেই সঙ্গে চলিল, হাত না ধরিলেও যাইত, আরও অনেকবার গিয়াছে। রসিক হাতও ধরিয়াছে খুব আস্তে, একবারও টানে নাই, কিশোর বয়সের ভীরু ভিক্ষুপন্থী প্রেমিকেরও আরও জোরে প্রিয়ার হাত ধরিয়া টানিবার অধিকার থাকে। তবু দু'জনেরই মনে হইতে লাগিল, একটা যেন জোর জবরদস্তির ব্যাপার চলিয়াছে, শান্তি যাইতে চায় না, রসিক তাকে টানিয়া চলিয়াছে গায়ের জোরে। শান্তির কথাগুলি কানে গেলে নিরপেক্ষ মনস্তত্ত্ববিদেরও তাই মনে হইত। ভদ্র কেরাণী-গৃহস্থের অল্পশিক্ষিতা গৃহিণী ভদ্র ভাষায় বস্তির মেয়ের মতন একজন পুরুষকে গাল দিতেছে; প্রতিবেশীদের কানে যাওয়ার ভয়ে গলাটা শুধু একটু চাপা আর ভদ্র পরিবারের পালিতা মেয়ে বলিয়া মুখের অসহায় আক্রোশের ছাপটা কাঁদুনে মেয়ের আব্দারের ভঙ্গির মত—এ-রহস্যের মূর্ত্তি এত বেশী রহস্যালেশহীন যে সেখানে উপস্থিত থাকিলে সঙ্কেতের মধ্যে আসল মানে খুঁজিয়া বাহির করিবার আগে আমি নিজেই হয়তো রসিকের মাথাটা ফাটাইয়া দিতাম।

গরীব গৃহস্থের ঘর, ঘরে ঢুকিলেই সেটা বুঝা যায়। কিন্তু আসবাবপত্র আর অতিরিক্ত সাজানো-গোছানোর স্পষ্ট পরিচয়ের মধ্যে একটা হাস্যকর অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে। মনে হয় গ্রামের মেয়ে যেন তেলচিটে কপালে সিঁদুরের টিপ পরার বদলে সেই সিঁদুর ঠোঁটে মাখিয়া পানের রসে ঠোঁট রাঙানোর অভ্যাসকে বাতিল করার চেষ্টা করিয়াছে। ইঁটের উপরে রাখা ট্রাঙ্ককে পরানো হইয়াছে রঙীন সুতার ফুল-তোলা পোষাক। সেগুনকাঠের কমদামী টেবিলকে শুধু চায়ের টেবিল করা হয় নাই, পাছে লোকে ভুল করে তাই টেবিলের উপর কমদামী, পুরানো ও অসম্পূর্ণ একটি চায়ের সেট-ও

সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। নীলামী গুদামের ছাপমারা কৌশলে জোড়াতালি দেওয়া এমন একটি বুকসেলফ্ একপাশে দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে আধুনিক ফ্যাসান-প্রিয় লাখপতির ঘরে অন্য আসবাবের মধ্যে আরও কয়েকটা বছর হয়তো সেটিকে বেমানান দেখাইত না। কাঠের এই জিনিষটিকে শান্তি বড় ভালবাসে, দু'বেলা ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে রঙটাই বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। গয়ণা কেনার বদলে সে নাকি এই আসবাবটি কিনিয়াছিল। এতবড় বুকসেলফ্ বোঝাই করার মত বই বাড়ীতে নাই, জীর্ণ আভিজাত্যের সঙ্গে খাপ খায় সেরকম বইও নাই, তাই চামড়ার বাঁধানো মাসিকপত্রের কয়েকটি ভল্যুমের সঙ্গে ছাপানো যা-কিছু পাওয়া গিয়াছে তাঁই দিয়া স্থান ভরিবার চেষ্টা করিয়া বাড়্তি তাকে মাটির পুতুল আর শান্তির প্রসাধনের সামগ্রী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। শান্তির প্রসাধনের জিনিষগুলি দামী, অভিজাত পরিবারের গৃহিণীরাই এত দামী জিনিষ ব্যবহার করে।

ঘরের পরিচ্ছন্নতাও ছবির মত কৃত্রিম। কোথাও এতটুকু আবর্জ্জনা নাই। এক কোণে অনেক উঁচুতে একটি মাকড়সা একটি মাত্র জাল বুনিয়াছে, কিন্তু জালটি নূতন বলিয়া আবর্জ্জনা মনে হয় না।

মেঝেতে ছেঁড়া রঙচটা সিঙ্গাপুরি মাদুরে জীর্ণ অয়েলক্লথের উপর নোংরা কাঁথার বিছানাটাও আবর্জ্জনা বলিয়া মনে হয় না, কারণ বিছানায় শান্তির ছেলেটি পাত্লা জাল-কাপড়ের ফ্রক গায়ে ঘুমাইয়া আছে।

চৌকির বিছানায় বসিয়া রসিক শান্তির হাত ছাড়িয়া দিল। তখনও শান্তির মুখ বন্ধ হয় নাই, যা মুখে আসিতেছে বলিয়া চলিতেছিল, একটু আশ্চর্য্য হইয়াই সে হঠাৎ থামিয়া গেল। ঝাঁঝালো রোদ হইতে ঘরের ঠাণ্ডা ছায়ায় ঢুকিয়াই রসিকের পিপাসা বাড়িয়া গিয়াছিল, গভীর শ্রান্তির সঙ্গে সে বলিল, 'একটু জল দেবেন?'

শান্তি আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।—'জল? দিচ্ছি।'

শান্তিকে ভয় না করিলেও শান্তির ভয়েই রসিক যতদিন না আসিয়া পারে, আসে না। অতিসভ্য আত্মীয়-বন্ধু আর তাদের অসভ্য রকমের বিকারগ্রস্তা আত্মীয়াদের সাহচর্য্যের টানে যতদিন দেহের তার ছিঁড়ি ছিঁড়ি না করে আর মনের সুর ধারালো বোমার মত বিস্ফোরণ না খোঁজে ততদিন, কোনবার সপ্তাহ, কোনবার মাস, একরকম কাটিয়া যায়। তারপর আসিতে হয়, শান্তি ছাড়া টনটনে তারটি শিথিল করিয়া সুরটি খাদে নামাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা জগতে আর কার আছে? ঘরে ঢুকিয়া বসিবার ধৈর্য্যও রসিকের থাকে না, আদরের বন্যায় দম আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হওয়ায় শান্তির গালাগালিও আপনা হইতেই থামিয়া যায়।

শ্রান্ত আর অবসন্ন রসিক আজ শান্ত হইয়া বসিয়া আছে, শুধু এই ব্যতিক্রম-টুকুই শান্তির মুখ বন্ধ করিয়া দিল। কাঁচের গ্লাসে জল আনিয়া দিয়া, খালি গ্লাশটি রাখিয়া আসিয়া, বেতের চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে রসিককে দেখিতে লাগিল। রসিকের মুখের চেহারাও আজ যেন বদলাইয়া গিয়াছে। খুব যেন ঘুম পাইয়াছে রসিকের। খুসী হইয়া শান্তি বলিল, 'কোথায় ছিলে একমাস ?'

'যেখানে চিরকাল থাকি।'

অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া শান্তি বলিল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করলেই তুমি এমন ভাবে জবাব দাও—'

'এখানে এসো।'

শান্তি চমকাইয়া উঠিল। 'না। বেশ তো আছি, জল চাইলে জল দিলাম—'

রসিক উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিতেই আজ প্রথম শান্তি হাত ছিনাইয়া নিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। পাশের ছোট ঘরটিতে ঢুকিয়া সশব্দে খিল বন্ধ করিয়া ভদ্র ভাষায় কয়েকটা রস্তির গাল দিয়া বলিল, 'বেরিয়ে যান আপনি আমার বাড়ী থেকে। যতক্ষণ না যাবেন, আমি দরজা খুলব না।'

দশ মিনিট পরে দরজা খুলিয়া স্খলিত পদে শান্তি এঘরে আসিল।

'একা মেয়েমানুষ আত্মরক্ষা করতে পারব না, তাই এলাম। আজকেই কিন্তু শেষ। ফের যদি আপনি এ-বাড়ীতে আসেন, গলায় দড়ি দিয়ে মরব—খোকার দিব্যি।'

রসিক সাড়া দিল না। চৌকীর বিছানাতে দেয়াল ঘেঁষিয়া সবগুলি বালিশ গাদা করিয়া আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়া সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ? শান্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল। কাল প্রায় এই সময়েই আকাশ কালো হইয়া প্রচণ্ড ঝড় উঠিবার উপক্রম ঘটিয়াও যখন ঝড় হয় নাই, তখন সে ঠিক এই রকম একটা নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। জাগাইবে ? রসিককে না হোক, খোকাকে ? খোকার পাশে বসিয়া তাকে জাগাইতে গিয়া শান্তি থামিয়া গেল। ঘুমন্ত ছেলেকে সে কোনদিন জাগায় নাই, আজ কেন জাগাইবে ? জাগিলেই দুরন্তপনা আরম্ভ করিয়া দিবে বৈ তো নয়। তার চেয়ে ঘুমন্ত ছেলের মুখে আলগোছে একটা চুমু খাইয়া বসিয়া বসিয়া ছেলের সুন্দর মুখখানাই দেখা যাক।

রসিকের ঘুমন্ত মুখও সে কখনও দ্যাখে নাই। ঘুমাইলে কেমন দেখায় রসিকের মুখ ? শ্রান্ত, শান্ত, কোমল। শান্তি যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আরেকটু ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সন্তর্পণে চোরের মত চৌকীতে উঠিয়া রসিকের মুখের কাছে মুখ নিয়া গেল। কতবার কাছাকাছি আসিয়াছে এ মুখ, এমন তো দেখায় নাই

কখনো! যে-চোখে ক্ষুধা আর ক্ষোভের তীব্র দৃষ্টিই শুধু সে দেখিয়াছে, যে-চোখের চামড়ার আবরণ খোকার কাজল-পরা চোখের মত মিষ্টি কোমল রহস্যময়। শুকনো চামড়ায়-গড়া ঠোঁট যেন মুখের আওতায় শিথিল হওয়ার সঙ্গে খোকার ঠোঁটের মতই রসালো হইয়া উঠিয়াছে।

একসঙ্গে বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করে আর চোখে জল আসে, এ অভিজ্ঞতা শান্তির ছিল না। হাত দু'টি অবশ হইয়া আসিতেছে, বেশীক্ষণ আর হাতের উপর ভর দিয়া এভাবে উবু হইয়া থাকা চলিবে না, হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া রসিকের গায়ের উপর পড়িয়া গেলেই সর্ব্বনাশ। জীবনে আর কোনদিন রসিককে আসিতে বারণ করা চলিবে না, আসিলে তিরস্কার করা চলিবে না। রসিক ভাবিবে, তার এতদিনের রাগ দুঃখ বিরক্তি আর বিরোধিতা সব গেঁয়ো মেয়ের ছলনা।

আলগোছে ঠোঁট স্পর্শ করা মাত্র রসিক চোখ মেলিয়া চাহিল। শান্তির হৃদস্পন্দন যেন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। খোকার ঘুম ভাঙে নাই, রসিকের ঘুম ভাঙিয়া গেল ? রসিক তবে নিশ্চয় ঘুমায় নাই, চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল।

'কি শান্তি ?'

নামিয়া গিয়া শান্তি খোকার বিছানার পাশে মেঝেতেই শুইয়া পড়িল, মুখ গুঁজিয়া দিল খোকার গন্ধময় কাঁথায়। এবার শান্তির মরাই ভাল, আর বাঁচিয়া কি হইবে ? রসিক নামিয়া আসিয়া তাকে চৌকীর উপর টানিয়া নিয়া যাইবে, এই প্রতীক্ষায় প্রতিমুহূর্ত্তে তার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হয়তো নামিয়া আসার কষ্টটুকুও রসিক স্বীকার করিবে না, ওখান হইতেই হুকুম দিবে, 'এখানে এসো।' অশিক্ষিতা, গেঁয়ো মেয়ে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এতদিন রসিক অভদ্রভাবে তাকে ভাল বাসিয়াছে, এখন হইতে গুণ্ডার মত ভালবাসিবে।

অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে কারও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, তিনটি প্রাণীই যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একবার রসিকের খুক্ খুক্ করিয়া মৃদু একটু কাসির শব্দ পাওয়া গেল, তারপর আবার সব চুপচাপ। কাঁঝালো রোদে ঘুরিয়া বেড়ানোর শ্রান্তিতে জোরে কাসিবার শক্তিও যেন রসিকের নাই। স্তিমিত দৃষ্টিতে সে শান্তিকে দেখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কাঁথায়-গোঁজা মুখ হইতে যখন একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিল তখন রসিক নীচে নামিয়া গেল। শান্তির পিঠে হাত রাখিয়া নাটক নভেল আর বাস্তবের প্রিয়াকে ডাকার চিরন্তন কাঁপা গলায় ডাকিল, 'শান্তি!'

শান্তির শরীরটা একবার চমকাইয়া উঠিল। কাঁপুনি বন্ধ হইয়া গেল।

'কেঁদো না শান্তি, আমি যাচ্ছি।'

শান্তি আরও জোরে কাঁথায় মুখ গুঁজিয়া দিল।

শান্তির পিঠ হইতে রসিক হাত সরাইয়া আনিল। আহত স্বরে বলিল, 'সত্যি চলে' যাচ্ছি। আর কোনদিন আসব না। আপনি সত্যি সত্যি মনে কষ্ট পান বুঝতে পারি নি।' ঘরের বাহিরে যাওয়ার আগে মুখ ফিরাইয়া অকারণে যোগ দিল, 'আচ্ছা, চললাম।'

সদর দরজা খুলিয়া একেবারে বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার আগে রসিক আরেকবার মুখ ফিরাইয়া ভিতরের দিকে চাহিল। শান্তি উঠিয়া আসিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়াছে। বাহির হইতে দরজাটা ভেজাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়া রসিক হন্ হন্ করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সদর দরজা বন্ধ করিয়া শান্তি ঘরে গেল। শাড়ীখানা গায়ে জড়াইয়া রঙীন সুতায় ফুলতোলা কাপড়ে ঢাকা পুরানো নড়বড়ে টেবিলে চিঠি লিখিতে বসিল। আরও অনেকবার রসিক যাওয়ার সময় বলিয়া গিয়াছে আর কখনো আসিবে না, দু'এক সপ্তাহ পরে, দু'এক মাস পরে আবার আসিয়াছে। কিন্তু সপ্তাহ মাস না কাটিলে এবার তো বুঝা যাইবে না সত্যই সে আর আসিবে না কিনা।

দামী প্যাডের নীল কাগজে শান্তি লিখিতে লাগিল : তোমার জন্য মন কেমন করছে। চিঠি পেলেই এসো। রাগ কোরো না, এবার থেকে আর কোনদিন তোমায় কড়া কথা বলব না।—

ঘুম ভাঙিয়া খোকা কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেও শান্তি চিঠি লেখা বন্ধ করিল না, বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়া বলিল, 'আঃ, একটু থাম্ না ছাই, চিঠিটা শেষ করে নি।'

সন্ধ্যার আগে এ-চিঠি ডাকে পাঠানোর উপায় নাই, তার আগে দুধওয়ালা দুধ দিতে আসিবে না। তবু এখন, অন্য কোন কাজ করার আগে, চিঠিটা শেষ করিয়া শান্তি নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

ছোট চিঠি, বেশী কথা লিখিবার কিছু নাই। চিঠি শেষ করিয়া খামে ভরিয়া শান্তি ঠিকানা লিখিতেছে, এমন সময় সদরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। চিঠি হাতে দরজার কাছে গিয়া শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

ওপাশ হইতে রসিক বলিল, 'আমি।'

হাতের খামখানা শান্তি মাঝামাঝি ছিঁড়িয়া ফেলিল। ঠিক ছিঁড়িয়া ফেলিল বলা যায় না, আপনা হইতে যেন ছিঁড়িয়া গেল। দু'টি টুকরা দু'হাতে শক্ত করিয়া মুঠা করিয়া ধরিয়া সমস্ত শরীর টান করিয়া শান্তি বলিল, 'কেন এসেছেন! ইতর কোথাকার।'

খোকা তখন গলা ফাটাইয়া চেঁচাইতেছে।

জীবিকাবৃত্তি*

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

আজ দেশে দেশে নানা জীবিকা। জীবিকার অন্বেষণে ও অবলম্বনে মানুষ যেসব কর্ম ও প্রচেষ্টা করিতেছে সেগুলির সনিন্দ বা সপ্রশংস বর্ণনায় মানুষের ইতিহাস ভরিয়া উঠিয়াছে। অর্থনীতিজ্ঞ জীবিকার মূলে অর্থের সন্ধান রহিয়াছে এই ধারণা করিয়া মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে যে, মানুষের কার্যাবলী অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সাফল্য-বৈফল্যের বর্ণনা।

বিবিধ ধারণার উপর এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা। তন্মধ্যে অন্যতম,—মানুষের কয়েকটী মৌলিক বা জন্মগত প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনাদির দাবীসমূহ মিটাইতে অর্থাৎ জীবনযাত্রাকে গতিশীল রাখিতে অর্থকরী কর্ম ও প্রচেষ্টাদির সন্ধানে মানুষকে ছুটিতে হইতেছে। অতএব এই মতবাদ অনুসারে মানুষ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক জীব। কিন্তু শাস্ত্রবাদী হিন্দু ইহার প্রতিবাদকল্পে শাস্ত্রীয় উক্তির উল্লেখ করে "শাসন শতেনাপি বিদ্যা বিক্রয়ম্ ন করোমি।" সেবা ও ধর্মনিষ্ঠার প্রতি মানুষের জন্মগত প্রেরণা ও আসক্তি বুঝাইতে সে বর্ণাশ্রম ধর্মের নিদর্শন দেয়। সে বিশ্বাস করে ও করাইতে চায়। ধর্ম-প্রেরণার বশীভূত হইয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিনামূল্যে বিদ্যাদান করিয়া আসিয়াছে। সেবাপরায়ণ শূদ্র অর্থমূল্যকে উপেক্ষা করিয়া সমাজ ও মানুষের সেবা করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি অর্থকরী বিদ্যার প্রভাবে অনাচার আসিয়া সমাজে ঢুকিয়াছে বলিয়াই যত অনাসৃষ্টি, বেকার-সমস্যা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাদির দাবীসমূহের তাগিদকে উপলক্ষ্য করিয়া অল্পসংখ্যক মানুষ বহুসংখ্যককে উৎপীড়িত করিতেছে—মানুষের এই অর্থতান্ত্রিক অত্যাচার ও নির্যাতন রোধ করিতে গণতন্ত্রবিশ্বাসী গণতন্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছে। এই গণতন্ত্রকে কার্যফলিত করিতে গিয়া সে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাদির দাবীসমূহ মিটাইবার পথ সুগম করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এতদসম্পর্কে সে বলিয়াছে, কয়েক-জন ধনলিপ্সু ও ঐশ্বর্যবিলাসীর স্বার্থপরতা হেতুই জগতে এত দুঃখ ও অশান্তি। সে আরও বলিয়াছে, মানুষ মূখ্যত শান্তিপ্রিয় কিন্তু মুষ্টিমেয় মানুষ লাভের হিসাব ও অঙ্ক কষিয়া নিজস্ব সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইয়াই সংখ্যাধিক্যের

* এই প্রবন্ধে ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (পি. এইচ. ডি—লণ্ডন) জীবিকাবৃত্তি বলিতে জীবিকা ব্যাপারে স্ফুট ও অস্ফুট যাবতীয় উদ্দেশ্য, প্রবণতা, আসক্তি ও অনাসক্তি ইত্যাদি বহুবিধ মানসিকতায় অভিব্যক্ত মনোবৃত্তিকে বুঝাইয়াছেন—স: প:

অন্নবস্ত্রের কষ্টভোগ বাড়াইয়াছে; ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মানুষের মধ্যে দ্বেষ ও হিংসা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; প্রত্যেক মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাদি চরিতার্থ করিতে দাও, পারস্পরিক দ্বেষ ও সামাজিক অশান্তি দূর হইবে। ধনতন্ত্রবাদী এই বিচার ও যুক্তিকে খণ্ডন করিতে গিয়া বলিতেছে, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাদি সহজেই পূর্ণ করিলে তাহার নানাবিধ সমাজ ও সভ্যতার কল্যাণকর কার্যের প্রেরণা ও উৎসাহ নষ্ট হইবে এবং অতি সত্বরই সভ্যতা নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। অর্থকষ্টে পড়িয়াই মানুষ বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির প্রতি উদ্যোগী হইয়াছে। ধনতন্ত্রবাদী আরও বলিয়াছে, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ ও পারিবারিক নেশাকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ কার্যমুখীন হইয়াছে। বুদ্ধিপূর্বক আলোচনায় ইহার পক্ষে-বিপক্ষে বহু যুক্তি ও যুক্তিবোধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধনতন্ত্রবাদীর প্রতিবাদ-উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রবিশ্বাসী বলিতেছে, মানুষ স্বতই সৃষ্টিমুখীন ও সৃষ্টিশীল। তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনাদির দাবী মিটাইতে মানুষকে যে-পরিশ্রম করিতে এবং যে-অশান্তি ও আশঙ্কা পোয়াইতে হইতেছে, মৌলিক প্রয়োজনাদির দাবী-পূরণের পথ সুগম ও সহজলব্ধ করিয়া দিলে তাহার পক্ষে সেগুলির লাঘব হইবে। তখন সে শান্তিহৃদয়ে ও তৃপ্তমনে অবসর-বিনোদনের জন্য বহুপ্রকার সৃষ্টিমূলক কর্মে নিরত হইবে। সভ্যতা ও তথা মানবজগতের উন্নতি ঘটিবে। গণতন্ত্রবাদীর এই ধারণা ও আশ্বাস নিছক মিথ্যা নহে এবং ধনতন্ত্রবাদীর সংশয়ও ভিত্তিহীন নহে।

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাদির দাবীসমূহের হিসাব ঠিক নয়। তাই মানুষের জীবিকাবৃত্তির আলোচনায় নিম্নলিখিত বহু প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাদির দাবীসমূহ কি? মানুষের সৃষ্টিমূলক কার্য যথা, কাব্য-রচনা, চিত্র-শিল্পের মূলে কি সেই সব দাবী চরিতার্থ করিবার প্রেরণা ও বেদনা নাই? অর্থ-প্রয়োজনের সুরাহা করিয়া মানুষ কোন দাবী মিটাইতেছে? ধনলিপ্সা, মানুষ যে ধনসংগ্রহ ও সঞ্চয়ের নেশায় ছুটিতেছে তাহার সে-প্রেরণা বা তাড়নার মূল কোথায়? যে-মানুষ যশের নেশায় মত্ত, তাহার সে-মত্ততার নিগূঢ় অর্থই বা কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে মনোবিজ্ঞানীর জীবিকাবৃত্তির জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়।

মনোবিদ পূর্বোল্লিখিত মতবাদে ও মতবাদ-খণ্ডনে মাত্র সন্তুষ্ট নয়। সে মানুষের কর্মবিধান, কর্মসাধন ও কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে মানুষ-মনের বিকাশ, বিকার ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিতে চায়। সে মনোবিদ্যায় দৃষ্টিভঙ্গী ও তদ্‌জ্ঞানসম্ভূত অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আপাত কারণ ও তথাগত যুক্তির তলায় নিহিত মনের গভীরতায় প্রবেশ করে।

স্বীকার করিতে হয়, বর্তমান যুগে মানুষের জীবিকার প্রশ্নাদি জটিল সমস্যাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কল্পনা করা যায়, মানুষের ইতিহাসে এমন যুগ ছিল যখন জীবিকার সমস্যা শারীরিক বলকে মাত্র কেন্দ্র করিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ গায়ের জোরে খাদ্যসংগ্রহ ও কামপাত্রী আহরণ করিয়া মানুষ-মনের আদিম প্রয়োজনের দাবী মিটাইত। পশুরাও ঐ উপায়ে আজও জীবনের প্রয়োজনাদি তৃপ্ত করিতেছে। কিন্তু নানা কারণে ক্রমে মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়া উঠিল, দেহ-মনের দাবী চরিতার্থ করিবার জন্য আদিম প্রথা ত্যাগ করিয়া মানুষকে জীবিকার বহু অ-সরল পথ অবলম্বন করিতে হইল। "সুবোধ যাহা পায় তাহাই খায়।" শিশুপাঠের এই উক্তির সার্থকতা মাত্র ক্ষোভ-প্রকাশে। অর্থ-চিন্তায় উদ্বিগ্ন ও অর্থকষ্টে প্রপীড়িত মানুষ ভাবে—সেই ছিল ভাল। হাজার ভাল হইলেও সে-প্রথায় ফিরিয়া যাওয়া যায় না। মানুষ যাহা পায় তাহা খাইতে পারে না এবং খাইলেও পেট ভরে না। ইহাকে মানব-সভ্যতার উন্নতিই বলুন কিংবা দুর্গতি বলুন, এখানে তাহার আলোচনা করিব না।

জীবিকা অর্থে মাত্র অর্থোপর্জনের পথকে উদ্দেশ করিয়া অনেক সময় জীবিকা-বৃত্তির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ ও তাহার সমস্যাদিকে রাজনীতি ও অর্থনীতির অন্তর্গত রাখা হয়। এদেশে একদিন বহু কার্যকে উপজীবিকা গণনায় অর্থমূল্যের বাহিরে রাখা হইত এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনও রাখা হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। সে একক তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। একক ব্যক্তি বহুর সাহায্য বোধ করে এবং বহু এককে সাহায্য করিতে উন্মুখ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম ও এই বোধের অভিব্যক্তি। বর্তমানে প্রচলিত 'পরিশ্রম-বিভাগ' বলিতে তাহাই বুঝান হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানে ভগবদ্‌বিশ্বাস ও মানবত্বের তারতম্য বিচার, বর্ণশ্রেষ্ঠ ও বর্ণাধমের বিচার ছিল। বলা হয়, পরিশ্রম-বিভাগের পরিকল্পনায় সে-মনোবৃত্তির উল্লেখ নাই। তাহা সত্য নহে। মানুষের জীবিকাবলম্বনে ও জীবিকাকার্যে সমাজের নিন্দা ও প্রশংসা সর্বদেশে সব সময়ই রহিয়াছে। এক যুগে বা এক সমাজে কায্য-শক্তি সর্বোচ্চভাবে আদৃত হইয়াছে, অন্য যুগে শরীর-চর্চা ও শক্তিকৌশল শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়াছে, অন্য এক যুগে বা সমাজে অর্থোপার্জন ও ঐশ্বর্যশালিতা চরম আদর পাইয়াছে, ইত্যাদি। বর্ণাশ্রম ধর্মে যেমন বংশ-পরম্পরায় মানুষের জীবিকা বাঁধা-ধরা তেমনই যুগ-পরম্পরায় সমাজের আদর্শ ও প্রীতিদৃষ্টি একই রহিয়া গিয়াছে।

আজ ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় হউক, যুগধর্মের প্রবল বন্যা বর্ণাশ্রমের খুঁটিগুলির

উপর আসিয়া ভাঙ্গিতেছে। এখন এ-দেশেও মানুষ বলিতে লজ্জা বোধ করে "ভগবান আমায় কামার করিয়া জন্ম দিয়াছেন।" পুরাতন পথে কষ্ট হইলেও ভগবদ্‌বিশ্বাসে আস্থা ও আশ্বাস ছিল। নূতন পথে বহু সমস্যা, বহুস্থানে আবছায়া।

জীবিকা-পথের আবছায়ায় সামান্য আলোক-সম্পাত এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। হয়ত জীবিকাবৃত্তির সমগ্র ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়া এ-প্রবন্ধে সম্ভব হইবে না; সম্ভবতঃ জীবিকাবৃত্তির কোন সমস্যাই সমাধান করা যাইবে না। কিন্তু জীবিকাবৃত্তির বহুবিধ সমস্যার কতকগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গকে এতদ্‌সম্বন্ধে সচেতন করা সম্ভব হইতে পারে। তাহার সার্থকতা জ্ঞান ও আলোচনার পরিধি বৃদ্ধিতে।

অন্যত্র এক ইংরাজী প্রবন্ধে আমি আলোচনা দিয়া বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়াছি যে, যদিও বহুমুখে 'অর্থের প্রয়োজনেই মাত্র মানুষ জীবিকা নির্বাচন' করার উক্তি ও যুক্তি শোনা যায়, তথাপি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে তাহা গ্রাহ্য নহে। জীবিকামাত্রই অর্থের সংস্থান করে কিন্তু বিশিষ্ট জীবিকা মনোনয়নে নির্বাচনকারীর অন্যান্য বহু উদ্দেশ্য ও বিবিধ তৃপ্তির আশা থাকে। মনোবিজ্ঞান ইহা বিশ্বাস করে বলিয়াই অর্থনীতি বা ধন-বিজ্ঞানের কবল হইতে জীবিকাবৃত্তির সমস্যাসমূহকে ছিনাইয়া লইয়া নিজ-আঙ্গিনার মধ্যে আনিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

জীবিকা নির্বাচন, অবলম্বন ও কার্য মানুষের জীবনে কোন খাপছাড়া কিম্বা একক আরব্ধ ব্যাপার নহে। জীবিকাবৃত্তি ও তাহার অভিব্যক্তি, ইহার পরিমাণ ও প্রসার, ইহার সাফল্যের সীমা ও বৈফল্যের চিত্র প্রভৃতি জীবনের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে সংশ্লিষ্ট। আদতে, জীবিকাবৃত্তি মানুষ-মনের এক বিশেষ অভিব্যক্তি। ইহা অন্যান্য অভিব্যক্তিগুলির সহিত প্রকৃষ্ট যোগ রাখে। তাই জীবিকাবৃত্তির আলোচনায় মানুষ-মনের মূল প্রবৃত্তিবর্গের কথা অনন্যোপায় হইয়াই বলিতে হয়। তাহা শুনিলে সূক্ষ্মভাব, বুদ্ধিগত দর্শন আলোচনার মত ঠেকিতে পারে। তথাপি জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিলে জীবন-বৃত্তি, যাহার জন্য দীর্ঘকালব্যাপি শিক্ষা ও অভ্যাস গঠনাদি, যাহার অবলম্বন ও কার্য এবং সর্বশেষে যাহা হইতে অবসর গ্রহণান্তর ভাতালাভ ইত্যাদিতে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়, সেই জীবন-বৃত্তি সম্বন্ধীয় সমস্যা ও জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি হয় না। (ক্রমশঃ)

দাবি

পূর্ণেন্দু গুহ

নারায়ণী ভাঁড়ারের দরজার সুমুখে বসে' তরকারী কুটছিল। তার ডান-দিকে তরকারির ঝুড়িতে নানা প্রকারের তরকারি, বাঁ দিকে ঝকঝকে একটি থালা, তা'তে রন্ধনশালার উপযুক্ত আভিজাত্য-প্রাপ্ত চাঁচা-ঘসা, ছাঁটা-কাঁটা সব তরকারি ভাগে-ভাগে সাজান। বঁটির সাম্‌নাটায় নানাজাতীয় তরকারির পরিত্যজ্য অংশের একটা স্তূপ।

ভাঁড়ারের দরজা থেকে লম্বা একটা বারান্দা সোজা গিয়ে ওদিকের একটা মস্ত ঘরের দরজায় শেষ হয়েছে। ভাঁড়ারের দিকে বারান্দার অংশটা চওড়া, সেখানে এদিকে ওদিকে ছোট বড় নানা আকারের কয়েকটা পিঁড়ি নানাভাবে পড়ে আছে। পিঁড়িগুলির মাঝখানের স্বল্প স্থানটুকুর বিক্ষিপ্ত পেয়ালা পিরিচ চামচে রেকাবির অশোভন দৃশ্য এ-বাড়ীর প্রাতঃকালীন চা-পান শেষের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

পিঁড়িতে বসে' সেদিনকার খবরের কাগজখানা অনন্ত পড়ছিল। চা-পানকারীদের মধ্যে একমাত্র সেই বসে'। তার সামনে চা-র পেয়ালাতে খানিকটা ঠাণ্ডা চা উষ্ণ অবস্থার বাদামী-শোভা খুইয়ে খয়ের-গোলা রং ধারণ করেছে। রেকাবিতে অর্দ্ধভুক্ত এক টুকরো রুটি, তার প্যাশে চা নাড়বার জন্য ব্যবহার করা হ'য়েছিল এমন একটা চামচে—মলিনতার আস্তরণ পড়া।

মতি! মতি! ...লক্ষ্মীছাড়ী... না, ওকে দিয়ে আর চলছে না,...দ্যাখ্, একটা ঘর পুঁছতে কত সময় নিচ্ছে। সেই যে ঢুকেছে বেরুবার নাম করে না, ...খালি ফাঁকি আর ফাঁকি।—উচ্চস্বরে কথাগুলি নারায়ণী একসঙ্গে বলে' গেল।

কাগজের উপর থেকে মুখ না তুলে একটা অস্বাভাবিক আতিশয্যের সঙ্গে অনন্ত বল্‌লে: ছুঁড়ি মহাবজ্জাত,...আমি ত কবে থেকেই বলছি—ওকে বিদেয় করুন, বিদেয় করুন—পয়সা দিয়ে কেন এত কষ্ট সওয়া,—তা সে-কথা যখন কানে তুলবেন না, তখন ভোগ ছাড়া আর গত্যন্তর কি!

উঃ, বেরুতে পারলি? আমি ত ধ'রে নিয়েছিলাম তুই বুঝি মরে' রয়েছিস! —ঝাঁঝাল কণ্ঠে নারায়ণী বলে' উঠল।

বারান্দার উল্টোদিকে বড় ঘরের দরজার সম্মুখে ডান হাতে একটা ছোট বাঁল্‌তি নিয়ে মতি দাঁড়িয়ে। তার পরণের ময়লা কাপড়খানা হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি নেমেছে। ভাল অবস্থায় প্রতিপালিত হবার সৌভাগ্য মিল্‌লে নিঃসংশয়ে সে সুশ্রী বলে' গণ্য হ'ত। দারিদ্র্যের মলিনতা ও ক্লিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে দেহের উজ্জল রং নূতন আবিষ্কারের মত হঠাৎ এক এক সময় চোখে ঠেকে। যৌবনের সহজ বিকাশ তার দেহে ব্যাহত হয়েছে, তাই বয়স ঠিক কত অনুমান করা শক্ত—তেরো থেকে ষোলর মধ্যে যা-কিছু ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

নারায়ণীর কথার উত্তরে কর্কশ কণ্ঠে মতি কি কতগুলি বল্‌ল। তার বিকৃত বাংলা এমনিতেই বোঝা শক্ত, তার উপর সে যখন উষ্মাজড়িত কণ্ঠে অতিদ্রুত তা বলে তখন প্রায়ই তা বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার বক্তব্য আন্দাজে এই মনে হ'ল—সে ছাড়া অন্য যে-কেউ অতবড় ঘরখানা এই কন্‌কনে শীতের সকালে পুঁছ্‌তে গেলে মাঁরাই পড়ত।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় অনন্ত দেখলো সিঁড়ির এক পাশে মস্ত একটা গ্লাসে খানিকটা চা ও একটা রেকাবিতে ছোট করে' কাটা কয়েক টুকরো রুটি নিয়ে মতি বসে' আছে। তার সামনে ময়লা চাদর গায়ে-জড়ান তিন চার বছরের দুটি শিশু উবু হয়ে বসে'। রোজ সকালে এবাড়ি থেকে মতি যে চা ও রুটি পায় তার অংশ ভোগের জন্য মতির দিদি লখুয়ার মা-র এই দুটি সন্তান ঠিক সময় সিঁড়ির কাছে হাজির হয়। সামান্য একটু চা ও অল্প কয়েক টুকরো রুটিকে ঘিরে যে লোলুপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করে' এই কয়টি প্রাণী নোংরা পরিবেশের মধ্যে বসে' আছে তা দেখে অনন্তর একটু মায়া হ'ল। সিঁড়ির পাশটাতে বাড়ীর কয়লা রাখার স্থান। কয়লার কালো কালো দাগে আশেপাশের মেঝেয় ও দেয়ালে অপরিচ্ছন্নতার কুশ্রী চিহ্ন। চারিদিকে উঁচু-শান-বাঁধান চাতালের ঝাঁঝ্‌রা বন্ধ হয়ে নোংরা জল জমে' পচা ডোবার মত দেখাচ্ছে, একটা আঁশ্‌টে বদ্‌গন্ধে চারিদিকের বাতাস ভারি হয়ে আছে। মাঝে-মাঝে যখন উত্তুরে হাওয়া এক একবার গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে তখন হাই-তোলা অপরিচ্ছন্ন মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা দুর্গন্ধের মত একটা অস্বাস্থ্যকর গন্ধ নাকে এসে লাগে, পেটের ভেতরটা পর্য্যন্ত যেন তাতে পাক খেয়ে উঠে গা বমি-বমি করে। চাতাল পার হয়ে সিঁড়ির ঠিক মুখোমুখি উল্টো দিকে কলতলা। কলের নাক জড়িয়ে নোংরা একটা ন্যাকড়া ঝুলছে। একপাশে একটা মরচে-পড়া ভাঙা

কড়ায়ে বাসন মাজার ছাই ও ছোবড়া রয়েছে, তার সামনে বিক্ষিপ্ত অল্পকিছু শুকনো কড়া ভাত, দু'চারটে আলুর খোসা ও কিছুটা ছাই ছড়িয়ে আছে। কলের ঠিক সামনে একটা কেরোসিনের টিনে ক্ষার-মেশান ঘোলাটে গরম জল,—অনেকগুলি কাপড় তাতে চোবান।

অনন্ত জানে চা-পান শেষ করে' ঐগুলো নিয়ে বেলা বারটা পর্য্যন্ত মতিকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হবে। অনুকম্পার মৃদু আলোড়নের সঙ্গে অনন্তর মধ্যে তার জ্যেঠিমা নারায়ণীর প্রতি বিদ্বেষ-মিশ্রিত কেমন এক ধরণের ঘৃণা জমে উঠল। সে বেশ বুঝল, নারায়ণী মতির অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার উপর যত খুসি কাজের চাপ দিচ্ছে। অন্য কোন ঝি-র পক্ষে এ-বাড়ীর স্বার্থসর্ব্বস্ব কর্ত্রীর অত্যধিক কাজের দাবী সহ্য করা অসম্ভব বলেই যে এ-বাড়ীতে এত ঘন-ঘন ঝি বদল হয়ে থাকে, তা অনন্তর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মতির অসহায় অবস্থাটা যে কি আজ তা অনন্ত প্রথম ভাল করে' ভেবে দেখলে। কাজে যোগ দেওয়া অথবা তা ত্যাগ করা কোনটাই মতির ইচ্ছাধীন নয়। যার ইচ্ছায় এ দুই-ই হতে পারে সে হচ্ছে লখুয়ার মা। মতির জন্য লখুয়ার মা কখনো কোন কাজের সন্ধান পেলে, একবার যদি সে তা মতির জন্য ঠিক করে' উঠতে পারে, তাহ'লে কাজে মতিকে নিযুক্ত হতেই হবে, তা সে যত প্রাণান্তিক পরিশ্রমই না কেন মতিকে স্বীকার করতে হোক। মাসান্তে মতির পরিশ্রমের টাকা লখুয়ার মা-র। টাকা ধার দিয়ে লোকে যেমন সুদ আদায় করে, ধার-দেওয়া টাকার অপরকে যেমন খুসি খাটাবার অধিকার দেয়, লখুয়ার মা-ও তেমনি মতিকে অন্যের অধিকারে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে মাসে-মাসে নিজে কিছু উপার্জ্জন করে। তা করুক, তাতে মতির দুঃখ নেই, কেননা টাকা জিনিষটার পূর্ণ গৌরবের সংজ্ঞা এখনো তার জন্মায় নি। তবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিদির ভয়ে যে-পরিশ্রম তাকে করতে হয় তা যদি সে না করে' পারত! দু'একবার দিদির ইচ্ছাকে ঠেলে নিজের ইচ্ছাকে স্থায়ী করতে গিয়ে যে ফল সে পেয়েছে তা একান্ত অসহনীয়। সেই থেকে নিজের ইচ্ছার কথা তার আর ভাবতে সাহস হয় না।

অনন্ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এমন সময় মতির চোখে চোখ পড়াতে একটা অস্বস্তি তার দেহের মধ্যে মোচড় দিয়ে গেল। মতির ঐ ধরণের চাউনি যখনই অনন্ত লক্ষ্য করেছে, সে অস্বস্তি বোধ করেছে। কি যে ও-দৃষ্টিতে আছে তা অনন্ত ভাল করে' জানে না। মতির চোখ দুটি কাঁচের মত ঝক্‌ঝকে এবং সে যখন কারুর দিকে সেই চোখ তুলে তাকায় তখন চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যে মনের কোন আভাস থাকে না। তাই সব সময়ই তার দৃষ্টি অর্থহীন। পাথরের চোখের মতই

ব্যঞ্জনাহীন তার চোখ, পার্থক্য শুধু তাদের হীরের মত অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায়। কিন্তু বরাবর অনন্তর মনে হয়েছে মতি যখনই তার দিকে তাকিয়েছে তার চোখের ঐ উজ্জ্বলতার মধ্যে কেমন একটা একাগ্রতা যেন ফুটে উঠেছে। অনন্ত যে এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় তা মোটেও নয়। কিন্তু তবু তার মনে হয় এবং মনে হবার আর একটা কারণ এই যে, মতি একবার অনন্তর দিকে তাকালে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিতে প্রায়ই সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভুলে থাকে। সাধারণতঃ অনন্তর কোন-না-কোন একটা বকুনিতে মতি তাঁর চৈতন্য ফিরে পায়। মতির ঐ-ধরণের চাউনিতে প্রথমটা অনন্ত অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রাগে জ্বলে' ওঠে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে অনন্ত বলল : এই, আমার ঘর ঝাঁট দিস্‌নি কেন ?—অনন্তর কণ্ঠস্বরে শিশু দুটি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে উঠে দাঁড়াল। অনন্ত ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছে। মতি তখনো তার দিকে তেমনিভাবে তাকিয়ে আছে দেখে রাগে সে চেঁচিয়ে উঠল : হাবার মত হাঁ করে' তাকিয়ে থাকলেই হ'ল..... তোর ফাঁকি দেবার চেষ্টা তোর হাবা-সাজবার ভানের মধ্যেও ধরা পড়ে, তা জেনে রাখিস্।

মতি মুখ ম্লান করে' বলল : তুমার ঘোর তলা-বন্ধ ছিল, হামি কি কোরবে !—

—তুমি কি করবে ! তালা বন্ধ থাকলে চাবি চেয়ে নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে পার না, না ?—বল্‌তে-বল্‌তে অনন্ত বাইরে তার ঘরের দিকে গেল।

মতির প্রতি অনন্তর মনোভাবটা অদ্ভুত। তার মনের উপরি-স্তরে মতির প্রতি একটা বিদ্বেষ। এ-বিদ্বেষ সত্যিকারের নয়। মতিকে সে দু-চোখে দেখতে পারে না এইটে দশজনের কাছে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা থেকে তার মনে এ-বিদ্বেষ সংক্রামিত হয়েছে। তার প্রতি মতির আচরণের বিশেষত্ব তার মনে যে কোন দুর্ব্বলতা সঞ্চার করেনি এইটে সবাইকে জানাবার জন্যে মতির প্রতি সে অমন কৃত্রিম রূঢ় ব্যবহার করে' থাকে। অথচ, মনের কোণে মতির জন্যে তার যে করুণা ও কৌতূহল একেবারেই নেই এ-কথা বলা যায় না। নানা কথার মাঝে-মাঝে কৌশলে নারায়ণীর কাছ থেকে অনন্ত অনেক সময়ই মতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। নারায়ণীর কাছে সে শুনেছে, দশবছর বয়সের সময় লখুয়ার মা মতির বিয়ে দেয়। কিন্তু স্বামী অত্যন্ত অত্যাচার করে, তাই মতি তার কাছ থেকে পালিয়ে এসে লখুয়ার মা-র সঙ্গে থাকে। মাঝে-মাঝে যখন স্বামীর রোখ চাপে সে মতিকে নিতে আসে। মতি যেতে চায় না, মারধরের তখন আর অন্ত থাকে না।

অনন্তর নীচের ঘরটির ঠিক সামনে পাঁচিল-ঘেরা একটা অনেক কালের পুরোনো গোরস্থান। কবে কোন্ সুদূর কাল থেকে যে এখানে গোর দেওয়া বন্ধ হয়েছে কেউ তা বলতে পারে না। এখন শুধু ঝোপঝাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে এক-আধটা ভাঙা কবরের ক্ষতবিক্ষত চেহারা চোখে পড়ে। গোরস্থান পার হয়ে গলি। গলি থেকে বেরিয়ে-আসা একটা সরু মেটে পথ গোরস্থানের পশ্চিম দিকের দেয়াল ও তার সমান্তরালে অবস্থিত সার-বাঁধা কতকগুলি খোলার ঘরের মাঝখান দিয়ে অনন্তদের বাড়ী এসে শেষ হয়েছে। এই খোলার ঘরগুলির একটাতে লখুয়ার মা ও মতি থাকে।

দিন যত যেতে লাগল ততই অনন্তর প্রতি মতির আচরণ এমনি এক ধরণের হয়ে উঠতে লাগল যে অনন্ত অতিমাত্রায় অস্বস্তি ও সঙ্কোচে পীড়িত হয়ে উঠল। তার কেবলি মনে হয় কি-জানি লোকে কি ভাবে, হয়ত কত-কি কানা-ঘুষো করে ! একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় সে দিন কাটায়। মতি কাছে কোথাও থাকলে কেউ যদি অনন্তর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে অমনি তার মনে হয় এর মধ্যে কোন বিশেষ অর্থ আছে। মতি যখন তার ঘর ঝাঁট দিতে আসে, অনন্ত ভাল করে' ঘরের দরজা খুলে রাখে। টেবিলের সামনে চেয়ারটা এমনভাবে টেনে এনে বসে যাতে প্যাসেজ দিয়ে কেউ গেলে খোলা দরজা দিয়ে তার চোখ যেন অবশ্য একবার অনন্তর উপর পড়ে। প্যাসেজের উল্টো দিকে কাঠের পার্টিশনের ওদিকে আর-একটি ঘর। পাড়ার কোন এক বাড়ীর ছেলেদের পড়ার-ঘর হিসেবে ঐটে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যে কয়েকটি ছেলে পড়তে আসে, যাবার সময় ঘরে তালা দিয়ে যায়। সকালে মতি যখন ঘর ঝাঁট দিতে আসে তখন পড়ার পরিবর্ত্তে ঐ ঘরে প্রায়ই হাসি-তামাসা চলে। হাসি শুনলেই অনন্তর বুক টিপ্‌টিপ্ করে। সে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে মস্ত একখানা বই মুখের সামনে টেনে এনে মনোযোগের ভান করে। ও-ঘরে যখন সব চুপ তখনো অনন্তর মনে হয়, কি যেন ফিস্‌ফিস্ করে' ওখানে বলাবলি চলছে।··· মতি ঘর ঝাঁট দিতে এক-একদিন অনেক সময় নেয়, তার দেরীতে অনন্ত রাগে জ্বলে। কোন কোন দিন সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে এসে প্যাসেজটিতে দাঁড়ায়। কিন্তু এই বাইরে এসে দাঁড়ানোটা তার নিজের কাছেই যেন কেমন অশোভন বলে' ঠেকে। সে ভাবে এতে তার মনের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাচ্ছে। কি-জানি, লোকে এ-চাঞ্চল্যের কি অর্থ ধরে' নেবে ! অনন্ত সব চেয়ে বেশী বিব্রত হয়ে পড়ে যখন এক-একদিন দরজার কোণে-জমা ময়লা পরিষ্কার ক'রবার জন্য হঠাৎ মতি দরজা বন্ধ করে'

দেয়। ঘরের মধ্যে অনন্ত তখন দিশেহারা হয়ে ওঠে। কি যে সে করবে ভেবে পায় না, শুধু তার মনে হতে থাকে কেউ যদি জানতে পারে ঘরের মধ্যে মতি রয়েছে!

সেদিন সকালে ঘরে বসে' অনন্ত একমনে পড়ছে, মতি ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনন্তর কোন-কিছুতে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ এক সময় তার মনে হ'ল মতি অনেকক্ষণ হ'ল ঘর ঝাঁট দিতে এসেছে। বই থেকে মুখ তুলে মতির দিকে সে তাকাল। মতি ঝাঁটা হাতে উবু হয়ে বসে' একদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। রাগে অনন্তর সারাদেহ কেঁপে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে এ-দৃশ্য কেউ যদি দেখে থাকে,···কে জানে কতক্ষণ এভাবে মতি তাকিয়ে আছে—বিদ্যুতবেগে অনন্তর মনে এসব ভাবনা খেলে গেল। তীব্রকণ্ঠে সে বলে' উঠল: যা, হাঁ করে' তাকিয়ে থাকলে চলবে না, কুঁজোতে শীগ্‌গির জল ভরে' নিয়ে আয়।—মতি প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে কুঁজোটা যেই কাঁখে তুলতে যাবে অমনি কুঁজোটা ভেঙে গিয়ে মেঝেয় জল আর ভাঙা কুঁজোর টুকরোয় এক বিশ্রী কাণ্ড। হঠাৎ এমন ভাবে কুঁজোর তলাটা খসে' ঝালগা হয়ে গেল যে মতি খিল-খিল্ করে' হেসে উঠল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অনন্তর প্রচণ্ড ধমকে সে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। উন্মত্তের মত অনন্ত চীৎকার করে' উঠল: ভাঙ্‌লি ত, আমি কতদিন বলেছি ওর পাশটা ফাটা, সাবধানে তুলিস,—তা কথা কি আর মনে থাকে, খালি তড়বড় করে' কাজ সারা! যা, এক্ষুনি ঘর সাফ করে' যেমন করে' পারিস, বাজার থেকে কুঁজো এনে জল ভরে' দে।—মতি কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই অনন্ত হুঙ্কার দিয়ে উঠল: খবরদার, দশটা বাজে কথা বলে' যদি দোষ ঢাকতে চাস, তাহ'লে ঐ ঝাঁটা তুলে নিয়ে বুঝিয়ে দেব মিথ্যে কথা বলায় কি সুখ।

মতি আর কোন কথা বলতে সাহস পেল না, শুধু তার জল-ভরা ছল-ছল দুটি চোখ অনন্তর নির্ম্মম মুখের দিকে তুলে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। অনন্ত একবার চেয়ে দেখল, অস্পষ্ট একটা ব্যথায় বুকের ভিতরটা কি রকম করে' উঠল। স্বাভাবিক গলায় সে বলল: দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে,—যা, সব পরিষ্কার করে' ফেল।

রাত্রি তখন নটা। শীতকালে নটাই অনেক রাত। অনন্ত তার ঘরে বই খুলে হেগেলীয় ডায়লেক্‌টিক্‌সের জটিল তত্ত্ব অনুধাবন করছে। এমন সময় শুনল: দাদাবাবু!—বই থেকে চোখ তুলে অনন্ত দেখল দরজার সামনে লখুয়ার মা দাঁড়িয়ে

র'য়েছে। একটু বিস্মিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল: কি লখুয়ার মা, কিছু বলতে চাও?

দুটো টাকা দাও না,···ক'দিন পর ফিরিয়ে দেব।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে অনন্ত জানে, টাকা নিয়ে লখুয়ার মা কখনো তা ফিরিয়ে দেয় না, তাই বলল: আমার কাছে টাকা নেই।

দাও না।

নেই,—দেবো কোত্থেকে! যাও, বিরক্ত কোরো না, আমাকে পড়তে দাও।—কণ্ঠস্বরে অনন্তর বিরক্তি প্রকাশ পেল।

লখুয়ার মা একটু দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে নিলে, তারপর বলল: উঃ, আল্‌নার উপর তোমার কাপড়গুলো কি রকম হয়ে আছে, বিছানাটাই বা কেমন দেখাচ্ছে,··· আর ঐ জুতোগুলো—ইস্! মতি! এই মতি!

মতি নিকটেই বোধ হয় কোথাও ছিল, এসে উপস্থিত হ'ল। তার পরণের কাপড়খানা আশাতীত রকমের পরিষ্কার, দেহের ও মুখের অপরিচ্ছন্নতা এখন আর চোখে পড়ে না, স্পষ্ট বোঝা যায় যত্নের সঙ্গে তা অপসারণ করা হয়েছে। সমস্ত মুখে খুসির ভাব পরিস্ফুট।

লখুয়ার মা মতিকে দেখে বলল: দাদাবাবুর ঐ কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখ, বিছানাটা ঠিক করে' দে।

লখুয়ার মা-র আদেশমতো মতি ঘরে ঢুকে কাজ সুরু করে' দিল।

এত রাত্রে মতি তার ঘরে, অনন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগল। প্যাসেজ দিয়ে এখন যদি কেউ যায় আর দেখে মতি এখানে! তবু ভালো, ঐ-ঘরে আজ ছেলেগুলি পড়তে আসেনি। এখন পর্য্যন্ত যখন ওরা আসেনি তাহ'লে আজ আর আসবে না। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে ওরা আর আসে না,—অনন্ত এটা লক্ষ্য ক'রেছে। একবার ভাবলো লখুয়ার মা ও মতিকে চেঁচিয়ে বলে—যাও, এখান থেকে তোমরা শীগ্‌গির যাও। কিন্তু লখুয়ার মাকে কড়া কথা বলতে অনন্ত ভয় পায়। লখুয়ার মাকে সে চেনে। কড়া কথা ব'লে তাকে ক্ষেপিয়ে দিলে, সে হয়ত তার ঘরে মতির এই উপস্থিতি নিয়ে একটা কুৎসা রটিয়ে প্রতিশোধ তুলবে। কী যে ক'রবে স্থির ক'রতে না পেরে অনন্ত অস্থির হ'য়ে উঠলো। একবার ভাবলো দু'টো টাকা ছুড়ে দিয়ে বলে—যাও। কিন্তু অত সহজে দু'টো টাকা দিতে মন চায় না। এমন সময় লখুয়ার মা ব'লে উঠ্‌লো—উঃ, কী ঠাণ্ডা হাওয়া এই দরজা দিয়ে আসছে;—শীত ক'রছে না তোমার?—ব'লেই কপাটের যে পাটে ছিট্‌কিনি সেটা বন্ধ করে' ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিল। দরজার এ-অংশটা বন্ধ হওয়ায় কেউ যদি এখন প্যাসেজ দিয়ে যায় তাহ'লে

মতিকে তার চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। অনন্ত একটু স্বস্তি বোধ ক'রলো।··· পর মুহূর্ত্তে লখুয়ার মা ব'ল্‌লো : ও, আমি যে উনুনে ভাত চড়িয়ে এসেছি·····ভুলেই গিয়েছিলাম। আচ্ছা দাদাবাবু, আমি খানিকক্ষণের মধ্যেই আস্‌ছি,···তুমি টাকা বের করে' রেখো। আমি যদি না-ই আসি তাহ'লে মতির হাতে টাকা দিও।— ব'ল্‌তে-ব'লতে দরজার অপর অংশটা ভেজিয়ে দিয়ে লখুয়ার মা অদৃশ্য হ'লো।

দরজা বন্ধ করে' লখুয়ার মা-র এই আকস্মিক পলায়নে মুহূর্ত্তের মধ্যে অনন্তর কাছে সমস্ত ব্যাপারটার গূঢ় ইঙ্গিত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। কেন যে দরদ ঢেলে লখুয়ার মা আজ তার অগোছাল আল্‌না, অপরিপাটি বিছানা ও বিশৃঙ্খল জুতাগুলির উল্লেখ করে' তাদের সুব্যবস্থিত দেখবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে মতিকে ডেকে এনেছে তা' অনন্তর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে লখুয়ার মা মতির সর্ব্বনাশ কত-দূর পর্য্যন্ত যে ক'রতে প্রস্তুত তা' ভেবে অনন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য সে সম্পূর্ণ ভুলে গেল, এখন তার কী করা কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারের জঘন্যতা ও নীচতায় সমস্ত মন তার ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌লো। একবার সে মতির দিকে তাকালো। দেখ্‌লো, সেই চিরপুরিচিত উজ্জ্বল চোখ তার একাগ্র স্থির দৃষ্টি তার মুখের দিকে মেলে রেখেছে। সারা মুখে ও দেহে আনন্দের অপূর্ব্ব উদ্ভাস। ঈষৎ হাসিতে ঠোঁট ছুটি এমন একটু প্রসারিত হ'য়ে স্থির হ'য়ে আছে যে দেখে মনে হয় অন্তরের আবেগ ঐখানে বাধা পেয়ে সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। জামার উপরিভাগে অনাবৃত বুকের শুভ্র স্বল্প অংশে তীব্র আকর্ষণ। দুই কাঁধের মাঝখানে দৃঢ় নিটোল-সুন্দর নরম গ্রীবাটি এমনি আশ্চর্য্য ঋজুভাবে বসানো যে মনের মধ্যে তা' প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কামনামুগ্ধ নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে অনন্ত তাকিয়ে রইল। কতক্ষণে যে তার এ-বিহ্বলতা ঘুচ্‌তো বলা শক্ত। কিন্তু দরজার বাইরে হঠাৎ মতির নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে নিজের মধ্যে সে ফিরে এলো। সঙ্গে-সঙ্গে দরজার ভেজানো অংশটা ঠেলে লখুয়ার মা নিজের ভাষায় মতিকে তাড়াতাড়ি কী ব'ল্‌লো অনন্ত ঠিক্ তা' বুঝ্‌তে পারলো না। মতির আনন্দ-দীপ্ত মুখখানা মুহূর্ত্তের মধ্যে খুড়ির মত রং ধারণ ক'রলো। পরক্ষণেই সে লখুয়ার মা-র অনুসরণ করে' অন্তর্দ্ধান হ'লো।

বাইরে প্রচণ্ড গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়ে চল্‌লো। নানা আশঙ্কায় নিজের আত্মস্থ অবস্থা হারিয়ে ভয়ে অনন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। বহু কণ্ঠের সম্মিলিত রোলের মধ্য থেকে গোলমালের কারণ নির্ণয়ের জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে প্রতিটি শব্দ ধরার ব্যর্থ চেষ্টায় সে শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়লো। এই গোলমালের ভেতর থেকে মাঝে-মাঝে মতির ক্ষীণ সরু কণ্ঠধ্বনি এক-একবার তার কানে ভেসে এসে তার হৃৎপিণ্ডের গতি

দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে ঘরে যখন সে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে এমন সময় তার ছোট বোন দশ বছরের ইন্দু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বললো—অন্তুদা, উপরে এসো, দেখবে মতিকে তার বর মারছে। নিজের বাড়ী তাকে নিয়ে যাবে বলে' এসেছে, মতি যেতে চায় না, তাই মারছে।—তিক্তকণ্ঠে অনন্ত চীৎকার করে' উঠলো —যা, এক্ষুনি এখান থেকে যা, মতিকে কে মারছে তা' দেখবার জন্যে উপরে ছুটে যাবার সময় এখন আমার নেই ; কাজের সময় ফের যদি কখনো এসে আমাকে জ্বালাতন করিস তাহ'লে ভাল হবে না তা' জেনে রাখিস।—এ-অভ্যর্থনার জন্য ইন্দু মোটেই প্রস্তুত ছিল না, মুখ কালো করে' ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

গোলমাল ছাপিয়ে মতির তীব্র কান্না ঘন-ঘন অনন্তর কানে এসে পৌঁছুতে লাগলো। কোলাহল ও ক্রন্দন ক্রমেই দূরে সরে' সরে' যেতে লাগলো।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসহায় স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে টেনে নিয়ে চলা হ'লো। গভীর ব্যথার সঙ্গে অনন্তর মনের মধ্যে ঘন বিষণ্ণতা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌লো। নিষ্পলক উদাসীন দৃষ্টি মেলে বাইরে গোরস্থানের ঘন অন্ধকারের দিকে সে তাকিয়ে রইল। শীতের মলিন আকাশের জপের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, আকাশের বিষণ্ণতাকে আরো ভারী করে' নিদ্রালস কণ্ঠে কোন এক দূরের বাড়ী থেকে তরুণকণ্ঠে ঘন-ঘন আবৃত্ত হ'তে লাগলো—লেট্ এ, বি, সি be এ ট্রায়েঙ্গল,....লেট্ এ, বি, সি···

থেকে থেকে অন্যমনস্ক অনন্তর কানে শাসনভীত এই অনিচ্ছিত করুণ পাঠ মতির কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

মহাজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

টাকা চাই ? কত টাকা ? মেয়ের অসুখ ?
হাতচিঠা চলিবে না, পাকা তমশুক
দিতে যদি পারো দেখ ভাই-বোনে সবে,
রাজি আমি। যাও তবে গাঁয়ের মক্তবে
ডেকে আনো আয়ুব-মাস্টারে। অসুবিধা
কিছু নাই, তার কাছে আছে মুসাবিদা
সকল রকম, সুখৎ বন্ধক হ্যাণ্ডনোট
কবালা বা কবুলতি, যাহা চাও, মোট
সাত শো সাতান্নখানা। কালি কাগজাদি
আনিবে সে, সঙ্গে করে সমস্ত ইসাদী,
কিছুমাত্র ভয় নাই, সব হবে ঠিক।
তবে বাপু, আসলের কী হবে নিরিখ
শুনে রাখো : চোদ্দ নিলে লিখিবে আটাশ,
একশোতে দু শো টাকা, সুদ মাস-মাস
টাকা প্রতি দুই আনা। রাজি আছ ? বেশ,
দোফসল জমি তব শুনেছি সরেশ
দশ কাঠা তিন ধুল, সুদের বদলে
ওটা কিন্তু ছেড়ে দেবে আমার দখলে।
আচ্ছা, বেশ, ক্ষুণ্ণ করে লইলাম গ্রাস
দশটি বছর খেয়ে করিব খালাস
সুদ ও আসল। ওটুকু জানিয়ো ঠিক
তোমাতে-আমাতে কথা রহিল মৌখিক
আর সাক্ষী উপরালা। হবে না মকুব
এর চেয়ে বেশি। ওই আসিছে আয়ুব।
পত্রমিদ কার্যঞ্চাগে—লেখ তবে খৎ

বেওজরে কোনাকুনি দাও দস্তখৎ
একে একে সকলের হয়ে। নিরক্ষর ?
টিপসই ঢেড়াসই কিম্বা অনন্তর
কোনোক্রমে চলিবে কলম ছুঁয়ে দিলে।
নিচেটাতে ফাঁক থাক, হোথা তপশীলে
জমির বর্ণনা যাবে, দাগ ও খতেন
সঙ্গে নাই, সাক্ষীরাও নাই মোতায়েন,
ওটা পরে লেখা হবে। টাকা ? নই চোর,
এখন পঞ্চাশ কিন্তু নেবে একশোর,
বাকিটা অঘ্রান মাসে, জমিতে তোমার
ফসল যখন পাবে মোর আধিয়ার।
এর ভাই, মাপ করো, না হইবে রদ,
খতে লেখা দুশো টাকা রহিল নগদ
ও শুধু খতের লজ্জ, করিনু কবুল
আসলে আসল-সুদ ফসলে উশুল
দশটি বছরে পুরা। কিছু নাই ভয়
দশ কাঠা দশ বিঘা হবে না নিশ্চয়
দলিলের তপশীলে। আজ হলো বিশে,
চলে এসো কালকেই রেজেষ্টি আপিসে
সকলে সদলে। কাছে জমিদার-ডিহি
লোক পাবে সেথা, করিবে নিশানদিহি
অনায়াসে হাকিমের কাছে। সম্পাদন
মেনে নিয়ো। তুমি দেনী আমি মহাজন।
ব্যস্ত কেন ? সেখানেই দেয়া যাবে টাকা,
এখনি ছাড়িনি জেনো ধর্মের এলাকা।

রূপান্তর

হীরালাল দাশগুপ্ত

অগ্নিশিখায় নাচিছে পুচ্ছ ধূমকেতুর
কাল-বৈশাখী মেঘে-মেঘে ঘোড়দৌড়।

ঝড়ের লাঙল বিঁধেছে মাটির বুকে
নতুন চাষারা ছড়ায় নতুন বীজ।

আলোর দেবতা আসিছে অগ্নিরথে
বরণ করিব গাহিয়া মরণ গান।

লোহার হাতুড়ী কাস্তেরে ডেকে কয়:
সোনার পিণ্ডে করিব পিণ্ডদান।

সাঙ্গ

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কথার পুঁজি ফুরালো এতকালে,
হ'ল না বলা ছিল যা বলিবার,
বোবার আঁখি অশ্রুতে এবার
নীরবে শুধু মরমবাণী বলে।
অফোটা কুঁড়ি ঝরিল ডালে ডালে,
হ'ল না গাঁথা তোমার ফুলহার,
জোয়ার গেল, দখিণা নাই আর,
তোমার কূলে কে লবে ভরা পালে?

নৌকা ঠেকে গাঙের মাটি তটে,
গানের তরী অচল হ'ল পাঁকে,

বৈঠা তুলি নীরবে ব'সে থাকি।
ঘনায় রাতি, কাজলঘন পটে
অন্ধ আঁখি তোমার ছবি আঁকে,
মৌন রবে তোমারে শুধু ডাকি।

ঘর

সৌরীন্দ্র মিত্র

ছোট্ট এ-ঘর নীলাভ পর্দাটানা।
শেল্‌ফ আল্‌মারি টেবিলে ধরে না বই।
রেশ্‌মি ছায়ারা। শয্যা নিভাঁজ। তবু
আমি যেন হেথা ছায়া ছাড়া কিছু নই।

দীর্ঘ দুপুর কাটে টেবিলের ধারে—
হিম-হিম ছায়া দেয়ালে-দেয়ালে ঘোরে
ছাপা অক্ষরে হিজিবিজি-কাটা দিন,
রাত্রি এখানে পৌষী কুয়াশালীন।

ওপারে আকাশ সংমত আর কঠিনদৃষ্টি, নীল।
কদাচিৎ ওড়ে চিল।
সেখানে ওঠে না ঝড়।
রবিঠাকুরের ছবিখানি কাঁপে হাওয়া দিলে বড় জোর।

রাতের তারারা বড় যেন দূরে-সরা।

চার দেয়ালের মাঝে আমি ঘুরি-ফিরি,
ছায়াদের মাঝে ছায়া।
এ-ঘর কখনও স্বপ্নে দেখে না রূপকথা-নীল মেঘ
নামে না এখানে কৃত্তিকাদের মায়া।
এখানে আসে না বিষুব-রজনী রক্ত উল্কা-ঝরা॥

ভিজিট

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দারুণ গ্রীষ্মে গায়ে একটা ভারি ছেঁড়া কোট। পরণের কাপড়টা হাঁটু অবধি এসে থেমে গেছে। মাথার এক তৃতীয়াংশ চুলে পাক ধরেছে। হাত চেপে ধরলো : 'চিন্‌তে পারেন ?'

এ অবস্থায় একটু অপ্রস্তুত হওয়া স্বাভাবিক। কোথায় যে দেখেছি ঠিক মনে করতে পারিনা অথচ ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিব্যি হাসছে।

'ভুলে গেছেন, ভুলে গেলেন তো ? আশ্চর্য্য !'

বললাম, 'তাই তো, কবে যেন—'

'কেন, সেই টালি—টালিগঞ্জের ট্রাম—' বলতে বলতে লোকটির চোখ দুটো আস্তে আস্তে গোল-হ'য়ে এলো : 'বিড়ির আগুন লেগে আমার কাপড়-চোপড়—'

চট্ করে' দৃশ্যটা মনে পড়ে। বললাম, 'বিড়ির আগুনে আপনার কাপড় পুড়ে গেল।'

'হে—হে—' প্রবল উৎসাহে ভদ্রলোক এবার আমার হাত চেপে ধরলে। 'কাপড় কেন, আমি নিজেই তো পুড়ে গেছলুম মশাই, আপনি সেদিন না থাকলে রক্ষে ছিলো নাকি—'

'নমস্কার।' এবার কুশল-সংবাদ জিগ্‌গেস করবার পালা, বললাম, 'ভালো আছেন—'

'আর ভাল'—কপাল কুঞ্চিত করে' ভদ্রলোক পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বার করলে,—'চলে ?'

'না, থাক।'

বিড়ি ধরিয়ে লোকটি হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হ'য়ে যায়। তাকালো ইদিক-ওদিক। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে পরে : 'সেদিনের সেই ঘটনার পর ক'দিন আপনাকে খুঁজেছি মশাই।'

একটু অবাক হই : 'আমায়, আমাকে খুঁজছেন ?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অতবড় মহর, চোখ থেকে একবার ফস্কে গেলে চেনা-মুখও কি আর সহজে চোখে পড়ে।' আঙুল দিয়ে ভদ্রলোক আমার পকেটটা দেখিয়ে দিলে :

'ওখানে যে যন্তর লুকিয়ে রেখেছেন তা কি সহজে ভোলা যায়, না ভুলতে পারি। অষ্টপহর ওটাই থেকে থেকে মনে পড়ছে।'

পকেটে ষ্টেথ্‌স্‌কোপ। বুঝলাম আমায় খুঁজে বেড়াবার সঙ্গত কারণ। 'ঘরে রোগী আছে বুঝি ?'

'ঘরে !' যেন কথাটা বলে অপরাধ করেছি, ভদ্রলোক রীতিমতো ধমক দিয়ে উঠলো : 'বলুন ঘরে-বাইরে সর্বত্র। রোগী নিয়েই তো আজ আমি পথের ভিখিরী মশাই—নইলে আমার—' কথা শেষ হ'লনা। এখান অবধি এসে ভদ্রলোক এমন প্রচণ্ড বেগে কাশ্‌তে আরম্ভ করলো যেন সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওর পক্ষে অসম্ভব। কাশ্‌তে কাশ্‌তে বেঁকে ভেঙে পড়বার উপক্রম। একটু পর, খানিকটা সুস্থ হ'য়ে : 'নইলে আমার কিছু চিন্তা ছিল নাকি।' ভদ্রলোক তখনো হাঁপাচ্ছে।

বললাম, 'এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসুন।'

'না না, বসতে হবেনা। ওটা হ'ল কিনা আমার আঠারো বছরের হাঁপানি, গা-সওয়া হ'য়ে গেছে।' হাসবার একটু ভঙ্গী করে' ভদ্রলোক ফের গম্ভীর হ'য়ে গেলো : 'আর, এরি সূত্র ধরে' অতুল আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করলে মশাই !'

'অতুলটি কে ?'

'বলব, সবই বলছি, ফ্রেণ্ড্‌শিপ্ যখন হয়েছেই আপনাকে না-বলাটা ঠিক হবেনা।' ভদ্রলোক আমার হাত ধরে' টানছে : 'এখানে নয়, জায়গাটা বড্ড পাব্লিক,—চলুন ওদিকে যাই।'

ট্রাম ষ্ট্যাণ্ড্ পেছনে রেখে একটা গলির মুখে ভদ্রলোক আমায় টেনে নিয়ে গেলো। 'আর যদি কিছু মনে না করেন, খুব বেশি দূর নয়,' গলির একদিকে আঙুল বাড়িয়ে আমার মুখের দিকে ভদ্রলোক ভারি করুণ চোখে তাকালো : 'গরীবের ঘরে পায়ের ধূলো দেন তো—'

'পাগল হয়েছেন।' তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরি। 'এতে আবার পায়ের ধূলো-টুলো ওঠে নাকি, আমি যে বেড়াতেই বেরিয়েছি, চলুন।'

ভদ্রলোক মহাখুসী। 'সাধে বলেছে, আপনও পর হয় আর পরও আপন হয়, না হ'লে আপনার সঙ্গে ক'দিনের আর পরিচয়। আর দেখুন—' আমার চোখের ওপর হাতের দশটা আঙুল প্রসারিত করে' ভদ্রলোক আরম্ভ করলো, 'দশ আড়াই পঁচিশ, পঁচিশ বছর এক সঙ্গে এক টেবিলে বসে' অতুলটার সঙ্গে কাজ করলাম তো, শেষ পর্য্যন্ত ও কিনা আমার সঙ্গে এমন করলে !'

'আপনার কলিগ্ ছিল বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

শ্রাবণের মেঘের মতো ভদ্রলোকের চেহারাটা থম্‌থম্‌ করে। বললে, 'তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে একদিন কথা কাটাকাটি, আর ও কিনা ওমনি সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করলে নিবারণ রক্ষিতের যক্ষা, শীগ্‌গির না তাড়ালে ও আপিসশুদ্ধ, সবাইকে ডোবাবে। ব্যস্‌, বিলিতি রক্ত টগ্‌বগিয়ে উঠলো,—নিকাল যাও। ফর্সা জবাব।'

'তাড়িয়ে দিলে!'

'তা আর কি! কত কাঁদাকাটি সাধাসাধি। পর্যন্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট। ছোট সাহেব রসিকতা করে' টিপ্পনি কাটলে, হাঁপানি আর যক্ষা টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ।'

গলিটা বাঁ-দিকে ঘুরে গেছে এবং সেদিকেই পা বাড়াই। ভদ্রলোক সংশোধন করে' দেয়: 'ডাইনে আসুন।'

প্রকাণ্ড দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সুড়ঙ্গের মতো সঙ্কীর্ণ পথ। একটা দেয়ালের গায়ে আস্তর নেই। কোনোদিন হয়তো ছিল। আজ সেখানে ছোট বড় নানা আকারের রাশি রাশি ঘুঁটে পড়েছে। ভদ্রলোক তেমনি অনর্গল বকে' চলেছে: 'আমার জন্যে নয় ডাক্তারবাবু, হাঁপানির ব্যামো নিয়ে কি আর বসে' আছি, ছুটোছুটি হাম্‌লা-মাম্‌লা সবই করতে হয়। আসলে মেয়েটাকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। টন্‌সিলের অসুখ। দুদিন ভাল থাকে তো ফের আরম্ভ হ'ল বেদনা-টাটানি, রাতে ঘুমোতে পারেনা, খেতে পারেনা। হরিপদকে ডেকে দেখালুম। মরদ হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বলে কিনা, আমার কোব্‌রেজী শাস্তরে এর ওষুধ নেই, ডাক্তার দেখাও। তা, রুই-কাত্‌লা ডাক্‌বার পয়সা কই বলুন। বাবুরা গাড়ী হাঁকিয়ে চলেন, কথার আগে ষোল টাকা ফী হাঁকেন। না না হাসবেন না, আপনার মতো সোনার মানুষ তো সবাই নয়—'

ভদ্রলোকের কথা শুনে হাসি সংবরণ করতে পারিনি। বললাম, 'সে তো ঠিকই, গরীবের অনেক অসুবিধে।'

'দাঁড়ান, এসে গেছি।'

একটা পুরনো কাঠের দরজা। আস্তে ধাক্কা দিতে খুলে যায়। চৌকাঠ পার হয়ে সঙ্কীর্ণ বারান্দা। মাঝখানে একসারি ইঁট বিছানো। হয়তো কাদা বাঁচাবার জন্যে।

না, বাইরে থেকে যতটা মনে হ'য়েছিল ভেতরে ঢুকে ততটা খারাপ ঠেক্‌লোনা। চুণকাম-করা, পর্দা-টাঙানো বসবাসের যোগ্য দিব্যি পরিচ্ছন্ন ঘর। একদিকে একটা খাট বিছানো। দেয়াল ঘেঁসে টেবিলটার চেহারা খুব সুন্দর না হলেও ভদ্রগোছের। হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোক সুইচ টিপে আলো জেলে দিলে। পড়ন্ত বেলায় যেটুকু

অন্ধকার জমে' উঠেছিলো দূর হ'ল। 'বসুন আপনি, পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।' পাশের দরজা দিয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেল।

একলা বসে' পাঁচ সাত মিনিট কাটে। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। বাড়ীটা অসম্ভব নির্জন। চেয়ারে বসে' ঘাড় টান করে' সোজা হ'য়ে দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখি। একটা পোকা বাল্‌বের চারদিকে অনর্গল ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ পাশে কপাট নড়ার শব্দ হয়। ঘাড় ফেরাই। একটি মেয়ে।

ভেতরে ঢুকেই দুটি হাত একত্র করে' নমস্কার জানিয়ে মেয়েটি সরে' গেল টেবিলের ধারে। আয়নায় সেখানে মুখ দেখলে কি খোপা ঠিক করলে বোঝা গেল না। আঠারো উনিশ বছর বয়েস। পরণে একটা ফর্সা কাপড়, হাত-কাটা ব্লাউজ গায়ে লক্ষ্য করলাম। এই সেই মেয়ে!

ফিরে এসে আস্তে আস্তে বললে, 'আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে?'

'না, অসুবিধে কি।' চেয়ারে একটু নড়ে' চড়ে' বসলাম, 'উনি কোথায়, বুড়ো ভদ্রলোক?'

'কে, বাবা! তাঁর ফিরতে দেরী হবে।'

মেয়েটি আবার সরে' যায় জানালার কাছে। কুঁচানো পর্দাটা টেনে ঠিক করে' দেয়। গুন্‌গুনিয়ে একটা গানের সুর সাধ্‌ছে বলেই মনে হ'ল। ভাবলাম, না এ সে মেয়ে নয়। অসুস্থ মানুষ গান গায় না। ভারি অস্বস্তি বোধ করি। আর, অবাক হই ভেবে এ-বয়সে এ-অবস্থায় একটি বাঙালী মেয়ের যতটা সঙ্কুচিত সুস্থির হবার কথা তা যেন ও-তে নেই। একা প্রায় ঘেমে উঠি। ভদ্রলোক হঠাৎ গেল কোথায়!

'বাবাকে খুঁজছিলেন! আপনার কিছু চাই বুঝি, সিগারেট খান?'

'না, সেকথা হচ্ছে না।' ব্যস্ত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। 'আমায় ডেকে আনলেন উনি, তাঁর মেয়ে না কা'র টন্‌সিলের অসুখ—'

'তাই বলুন।' ফিক্‌ করে' মেয়েটী হাসলো,—'বুড়ো মানুষ অনেক-কিছু বলে। আপনি বুঝি ডাক্তার!'

'হ্যাঁ।'

মেয়েটি হঠাৎ গম্ভীর। একদৃষ্টে আমার ষ্টেথ্‌সকোপটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলে। পরে পাশের সেই দরজার কাছে গিয়ে কপাট ফাঁক করে' উঁকি দিয়ে ফিরে এলো। এসে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, 'দয়া করে' পাশের ঘরে আসবেন ডাক্তারবাবু?'

'কেন, ও ঘরে কি!'

'আমার মা।'

'অসুস্থ নাকি?'

নিঃশব্দে ও ঘাড় নাড়লো। হেঁয়ালী অনেকটা কাটে। হঠাৎ কেন জানি মনে হয় মেয়ের অসুখের নাম করে' ভদ্রলোক আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে তার স্ত্রীকেও দেখাবে বলে'। মুখ ফুটে বলতে পারেনি তখন পাছে টাকা-পয়সা বেশি দিতে হয়। আর, মেয়েটির টন্‌সিলের অসুখ নেই তা-ই বা কে জানে, হয়তো মায়ের অসুখটাই ওর কাছে বড়। নিজের কথাটা চেপে যাচ্ছে। একটু রাগ হয়, কষ্টও হয়, ভদ্রলোকের কথা ভেবে। পালিয়ে যাবার প্রয়োজন ছিল কি!

'কোথায় আপনার মা, চলুন।'

পাশের দরজা দিয়ে ও আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চৌকাঠের ওপারে অন্ধকার খুপ্‌রি। সেটা সিঁড়িকোঠা কি বারান্দা বোঝা গেল না। ঠাণ্ডা পুরানো একটা গন্ধ বার বার নাক দিয়ে অনুভব করলাম। আঁকা-বাঁকা সরু পথ ধরে' আরো খানিকটা অগ্রসর হবার পর মেয়েটি শেষে এমন একটা জায়গায় এসে আমাকে দাঁড় করালে যেটাকে ঘর বা বারান্দা কিছুই বলা চলে না। মাথার ওপর এক ফালি ছাদ আর তিনদিকে টিনের বেড়া। কোণে কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। দারিদ্র্যের আসল চেহারাটা ধীরে ধীরে চোখে পড়ে। ময়লা, আবর্জনা আর ভাঙাচোরা-গৃহস্থালী নিয়ে এখানকার পৃথিবী। মেঝের একপাশে কাঁথা জড়িয়ে মহিলাটি শুয়ে ছিল। পায়ের শব্দে চমকে ওঠে: 'কে! কে ওখানে!'

'আমি।'

সাপ দেখেও মানুষ এমন আঁৎকে ওঠেনা, রীতিমতো আর্তনাদ করে' উঠলো মহিলাটি: 'আবার তুই আমার সামনে এসেছিস পোড়ামুখী, যা যা, সরে যা।'

'তোমার অসুখ কেমন দেখতে এলাম।'

'আ রে দরদ, কেন, আমি তোদের খাই না পরি, বড় যে সন্ধেবেলা আজ জ্বালাতে এলি।' মহিলাটি দাঁত খিচিয়ে উঠ্‌লো: 'তোরা বাপ-মেয়ে সুখে থাকগে। নরক ছেড়ে দিয়ে আমি ত আলাদা হয়েই পড়ে আছি।'

'ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এলাম, তোমার সেই বুকের ব্যথাটা—'

'না না দরকার নেই, তুই যা আমার চোখের ওপর থেকে।' বলতে বলতে উত্তেজনার প্রাবল্যে হাতের কাছে একটা লোহার বাটি ছিল মহিলাটি তা-ই মেয়েকে লক্ষ্য করে' ছুড়ে মারলে। গায়ে না লেগে সিমেন্টের ওপর সশব্দে বাড়ি খেয়ে

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

বাটিটা একপাশে ছিট্‌কে যায়। তারপর শুনলাম চাপা রুদ্ধ কান্না: 'আমি তোর ছায়া দেখতে চাইনে···আমায় এখানে মরতে দে—'

হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। মেয়েটি আঁচলে চোখ মুছলো। তারপর সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না, সঙ্গতও হতো না। আবার সেই আঁকা-বাঁকা সুড়ঙ্গ ঠেলে পথ দেখিয়ে মেয়েটি আমাকে তার ঘরে নিয়ে এলো। পাতাল থেকে উঠে এলাম মনে হয়।

'দেখলেন মা-র কাণ্ড!'

'হ্যাঁ, তা কি হয়েছে বলুন তো।' মেয়েটির মুখের দিকে তাকাই। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ও আস্তে আস্তে বললে, 'পাগল। অসুখে ভুগে মা-র মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।' চুপ করে' থাকি।

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, অসুখে ভুগে মানুষ পাগল হয়?'

'তা হতে পারে।' গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'আমি এখন যাই।' আবহাওয়াটা এমন বিশ্রী ঠেকছিলো।

'ওকি, বসবেন না!' মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে উঠলো, ফিরে এলো তার চঞ্চলতা।

'না, সময় নেই।' চৌকাঠের দিকে পা বাড়াই।

'পান খেয়ে যান।' করুণ বিষণ্ণ মুখে শেষ পর্য্যন্ত একটু হাসি টানবার চেষ্টা ছিল লক্ষ্য করলাম। সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে নেমে পড়ি।

বাইরে এসে অসুবিধা হয়। কোনদিন এদিকে আসিনি। কোন্ দিক দিয়ে যে লোকটা আমাকে টেনে এনেছিলো আর কোন্ রাস্তা দিয়ে বেরোতে হবে খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। গলির মাথায় এসে চম্‌কে উঠলাম। গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক ভীষণভাবে কাশ্‌ছে। আমাকে সামনে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়লো: 'হ'য়ে গেল, এরি মধ্যে ফিরে এলেন!'

'হ্যাঁ, তা কি করতে হবে আমায়,' ওর মুখের দিকে তাকাই। কিছু বুঝতে পারিনা।

'তা এ-ও একটা কথা বটে, সকলের পছন্দ তো একরকম নয়।' আপন মনে কি কতগুলো বিড়্‌বিড়্ করে' ভদ্রলোক ফস্ করে' আমার হাত চেপে ধরলো: 'যাক্‌গে, কথা কাটাকাটি করে' লাভ নেই, তা, মিনিট দশেক ছিলেন তো?'

'তা ছিলাম বৈ কি,' সন্দেহ হ'ল এ-ও পাগল কিনা। বললাম, 'কি চান আপনি!'

'এক-আধটা গান-টান শোনালে তো?'

'হ্যাঁ, আপনার মেয়ে নাচ্‌লে গাইলে,' লোকটা পাগল তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না, বললাম, 'এবার পথ ছেড়ে দিয়ে আমায় যেতে দিন।'

'আহা, রাগ করছেন ডাক্তারবাবু!' হাত ধরে ভদ্রলোক করুণ চোখে তাকালো: 'আমার অবস্থা জানেন তো, চাক্‌রী-বাকরি নেই। দু'টো টাকা আমাকে দিয়ে যেতেই হবে।'

ঝড়ের আকাশ

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিশ্বনাথ চৌধুরী

সকাল থেকে রমলাকে কি রকম যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। এতক্ষণ চুপ ক'রে ছাদের এক কোণে মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। কাল রাতে সামান্য একটা কথা নিয়ে মা-র সঙ্গে বেশ খানিকটা তর্ক হয়। সাধারণতঃ রমলা নিজের মতামত বড় একটা প্রকাশ করে না। অনেকক্ষণ সে চুপ করেই ছিল, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত প্রতিবাদ না ক'রে পারেনি।

শান্ত সহজ ভাবে সে শুধু বলেছিল, "তোমার পক্ষে এসব ভাল দেখায় না মা।"

হেমলতা সপ্তমে চড়ে একেবারে গর্জ্জন ক'রে উঠেছিলেন, "ভালো-মন্দর বিচার আমার চেয়ে তুই বেশী বুঝবি? দু'পাতা ইংরিজি শিখে এই হয়েছে! আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ একথা বল্‌তে সাহস করেনি। তোর বাবা তা ভালো ক'রে বুঝেছিলেন। আর সেইজন্যে—

"তা' জানি মা।" রমলার ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসির আভাষ ছিল।

হেমলতা একেবারে জ্বলে উঠলেন, চীৎকার ক'রে ডাকলেন, "আরতি!"

আরতি লাফাতে-লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে চিবুকের কাছে মুখ নিয়ে বল্‌লে, "আমাকে ডাকছিলে মা?"

"যা, সব সময় খুকীপনা আমার ভাললাগে না।" হাত দু'টো ঠেলে দিয়ে হেমলতা মুখ ফেরালেন।

রমলা গম্ভীর ভাবে বললে, "যা আরতি, মা-র মাথার তেলটা নিয়ে আয়।"

"আমাকে নিয়ে তোমার ঠাট্টা!" হেমলতা একেবারে রুখে দাঁড়ালেন।

"মা দুধ পুড়ে যাচ্ছে—শীগগীর—" আরতি হেমলতার হাত ধরে' টেনে এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে গেল।

"সে তুমি যাই কেন না মনে করো আমি কিন্তু যাচ্ছি না।" রমলা যথেষ্ট জোর দিয়েই কথাটা বললে।

"তা যাবে কেন? আজকালকার মেয়েদের মত ধিঙ্গী হয়ে থাকবে—আমি বেঁচে থাকতে সেটি হ'তে দিচ্ছি না।" একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, "বড় লোকের খেয়াল—মত বদলাতে কতক্ষণ।"

"কা'রও খেয়ালের খেলনা হবার সখ আমার নেই।" রমলার স্বর এবার তীক্ষ্ণ।

"তোর অহঙ্কারের কি আছে রমলা? রংটা একটু কটা, এই যা।"

"কিন্তু তবুও তোমার ধিক্কার হ'লো না, এই যা। তোমার ধৈর্য্যের প্রশংসা না ক'রে পারছি না।" রমলা বেশ দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলে।

"মেয়ের কী মেজাজ!" হেমলতা মুখটা বিকৃত করলেন।

"তবুও মায়ের মত নয়।" রমলা একটু খোঁচা দিয়ে হাসতে হাসতে চ'লে গেল।

হেমলতা গুম হ'য়ে বসে' রইলেন। আরতি এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো। একটু পরে কাছে এসে বললে, "কেন তুমি ভাবছো মা, দিদি ঠিক যাবে।"

"আমি যেন তাই ভাবছি!" হেমলতা রুক্ষ গলায় বল্‌লেন।

সবচেয়ে রমলার বিশ্রী লাগতো মিসেস দে-র সামনে হেমলতা যখন রমলার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে অনেক কথা বলে' যেতেন। মিসেস দে ঠোঁট বাঁকিয়ে হয়ত একটু হাসতেন, খানিকটা পিঠ-চাপড়ানোর মত। সময় সময় উৎসাহ দিতেন, আর রমলা লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইতো। হেমলতার এই গায়ে-পড়া বিগলিত ভাবকে সে মোটেই সহ্য করতে পারতো না।

তবু হেমলতা রমলাকে সঙ্গে না নিয়ে কোনদিনই মিসেস দে-র বাড়ী যেতে চাইতেন না। তাঁর বিশ্বাস, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে ক্রমশঃ তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। একদিনের ত্রুটিতে হয়ত খানিকটা ফাঁক থেকে যাবে। মেয়ের বুদ্ধির ওপর তিনি মোটেই নির্ভর করতে পারেন না। নিজের সুখ শান্তি বলতে আর কি আছে? মেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে একটু আশ্বস্ত হবেন সে ভরসাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

সকাল থেকে হেমলতার চেষ্টার শেষ নেই। কতবার ক'রে তিনি বোঝালেন "রায় বাহাদুর নিজে মুখ ফুটে যখন বলেছেন, না গেলে তাঁর অপমান করা হয়।"

"তা' জানি মা। কৃষ্ণাদি'র অসুখের সময় কতবার সে দেখতে চেয়েছিল—কিছুতেই তুমি যেতে দিলে না। তোমার ধারণায় মান অপমান বলে' হয়ত তার কিছু নেই! তাই তাকে সহজে আঘাত করতে পেরেছ।"

রমলার কথায় হেমলতা একটুও বিচলিত হ'য়েছেন বলে' মনে হ'লো না। বেশ স্বাভাবিক সহজ সুরেই বল্‌লেন, "কেন যে যেতে নিষেধ করেছি সে ত তুমি বুঝ্‌বে না মা। প্রথমতঃ রোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আমি মোটেই পছন্দ করি না, আর তা ছাড়া—" হেমলতা কথাটা শেষ না ক'রেই চুপ ক'রে গেলেন। একটু পরে আবার বল্‌লেন, "সে সব কথায় আর কাজ কি রমলা? সে যে এতটা নির্লজ্জ হতে পারবে এ আমি আশা করিনি। মিসেস দে-র কাছে তার জন্যে আমি মুখ দেখাতে পারি না।"

"কৃষ্ণাদি' না হ'য়ে যদি আমি হ'তাম তাহলে তোমার লজ্জার কোন কারণ থাক্‌তো না আশা করি।" অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গম্ভীরভাবে রমলা আবার বল্‌লে, "আমি এসব বিশ্বাস করি না মা। তোমরা যে রকম অনায়াসে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারো আমরা হয়ত তা পারি না। এই যে অশোকদা' এসেই কৃষ্ণাদি'র খোঁজ করছেন তোমরা হয়ত এর মধ্যেও একটা কিছু খুঁজে পাবে।"

"নতুন ক'রে আর কিছু পাবো না এই যা।" হেমলতার হাসিতে বিদ্রূপ মেশানো। একটু থেমে সনিঃশ্বাসে আবার বল্‌লেন, "অশোক এসে আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি। মিসেস দে খবরটা শুন্‌লে আরও খুসী হবেন।"

হেমলতার কথায় যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল রমলা তা' বুঝতে পেরেছে ব'লে মনে হলো না। হেমলতার কথার উত্তরে সে বল্‌লে, "তিনিও ত শুনলাম শীগগীরই চাক্‌রি নিয়ে সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন, তাঁর ভরসাই বা কতটুকু?"

"এর মধ্যেই একটা-কিছু ক'রে নিতে হবে।" হেমলতা এতক্ষণ ধ'রে কথা কাটাকাটিতে একটু বিরক্ত হ'য়েছেন মনে হলো। কর্কশ ভাবকে একটু মোলায়েম করার চেষ্টায় আরও বিকৃত ক'রে বল্‌লেন, "তোমার কি ইচ্ছে জান্‌তে পারি রমলা?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমিও একটা বিষয় ভুল করছো মা। এ যেন গাছের গোড়ায় কথা না ভেবে আগায় জল ঢালার মত।" কথার সঙ্গে সঙ্গে রমলা মুখ-চোখের এমন একটা ভাব প্রকাশ করলে, হেমলতা উচ্ছ্বসিত আবেগে একেবারে তাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন।

"জানি মা—সব দিক্ না ভেবে এগোবার মত বোকা আমি নই।" মুহূর্ত্তের জন্যে রমলা একটু অনমনস্ক হয়ে পড়েছিল, একটু পরে বল্‌লে, "তুমি দাঁড়াও মা—আমি আস্‌ছি এখুনি।"

ড্রয়িংরুমে সকলে গোল হ'য়ে বসে জটলা করছিল। মিসেস দে একটা নতুন ডিজাইনের স্কার্ফ নিয়ে ব্যস্ত। হাতের কাঁটা দুটো উল্ মুখে নিয়ে দ্রুত ওঠানামা করছে।

মিঃ দে পাইপটা মুখে নিয়ে একবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কুয়াসার আস্তরে আকাশ অস্পষ্ট। এই আবরণ ভেদ ক'রে সূর্য্যদেব যে কখন মুখ তুলে চাইবেন তা বলা কঠিন। অথচ আকাশের এই ধোঁয়াটে ভাবটা এমন বিশ্রী রকমের অলস ক'রে তোলে যে কোন-কিছু করতে ভাল লাগে না। নীচের অফিস ঘরে একরাশ urgent file জমা হ'য়ে আছে, মিঃ দে রোজই মনে করেন শেষ করবেন, কিন্তু হ'য়ে ওঠে না। হঠাৎ তিনি মনে মনে সংকল্প ক'রে বস্‌লেন এখুনি Breakfast খেয়েই অফিসে যাবেন। সেখানে নিজের চেয়ারে বস্‌তে পারলেই কলম স্বাভাবিক নিয়মে চল্‌তে থাক্‌বে। একটু কষ্ট হ'লেও কাজগুলো অন্ততঃ শেষ হবে—কোন জিনিষ শেষ করার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই।

মিঃ দে ঘরে ঢুকে রীতিমত বিস্মিত হ'লেন। হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে হেমলতার দিকে ফিরে বল্‌লেন, "ও আপনি!"

রমলা একপাশে জড়োসড়ো হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য ক'রে মন্দিরা তাকে টেনে কাছে আন্‌লে। চুলের ওপর আঙুল দিয়ে আদর ক'রে কানের কাছে মুখ এনে বল্‌লে, "আমায় বুঝি এরই মধ্যে ভুলে গেছ! তোমাদের 'নটীর পূজা'য় গ্রীনরুমে ব'সে সকলের জন্য চা' করলাম!"

"তার আগে যেন তোমায় চিন্‌তাম না?" রমলা মৃদুকণ্ঠে বললে।

মিসেস দে কাঁটার মুখ থেকে উলের জটটা ছাড়াতে ছাড়াতে বল্‌লেন, "সত্যি, ওরা অভিনয় করার জন্য এত প্রাইজ পেল, আমাদের বেবির কথা কারও মনেই হয়নি, কি ভয়ঙ্কর অন্যায় বলো ত!"

সকলেই উচ্ছ্বসিতভাবে প্রবল হেসে উঠ্‌লো। হেমলতা মন্দিরার পক্ষ সমর্থন ক'রে বল্‌লেন, "না দিদি, বেবি সেদিন ওদের জন্যে যা খেটেছে—ওদের উচিত সকলে মিলে ওকে একটা প্রাইজ দেওয়া।"

"তোমরা সকলে মিলে জোর ক'রে আমাকে Consolation Prize দেবে সেটি কিন্তু হচ্ছে না।" মন্দিরা রমলার দিকে ফিরে একটু হেসে বল্‌লে।

টেবিলে প্রাতরাশ সাজানো হয়েছে—বেয়ারা সেলাম জানাল।

মিঃ দে অতিথিদের নিয়ে উঠে পড়্‌লেন।

মন্দিরা সকলের পিছনে আস্‌ছিল—রমলার কানে কানে বল্‌লে, "এখন থেকে তোমায় কিন্তু বৌদি বলে' ডাক্‌বো।"

"অমন করো ত এখুনি চ'লে যাবো কিন্তু।" রমলা লজ্জায় লাল হ'য়ে বল্‌লে।

"তার মানে আর একটু বলো। আচ্ছা বেশ, একটা অক্ষর না হয় বাদ দিলাম। শুধু 'বৌ' ভাল লাগ্‌বে না বল্‌তে—একটা বিশেষণ দেয়া যাক্ 'রাঙা বৌ'—কেমন, পছন্দ হলো ?"

রমলা তার হাতে একটু চাপ দিয়ে বল্‌লে, "Naughty Girl."

মন্দিরা সুর করে' আবৃত্তি কর্‌লে :

"Ladies and Gentlemen,
Let us see what we can give.
Come away from life and let us live
A little fun, a little laughter
What after
—Love ."

রমলা মন্দিরার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, "মাসিমাকে বল্‌ছি এখুনি—Thy necessity is greater than mine."

"স্বচ্ছন্দে, Please আমি তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি রমলা।" মন্দিরার নাটকীয় ভঙ্গীতে রমলা উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠ্‌লো।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

চলচ্চিত্র

জে. বি.

সম্প্রতি একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে এ-দেশীয় সংস্কৃতিশীল ব্যক্তিরাও সিনেমার আর্ট সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনায় মনোনিবেশ ক'রেছেন। আজ-পর্যন্ত সিনেমা অন্যান্য শিল্পের সমকক্ষ কিনা—এইটাই হ'ল মুখ্য প্রশ্ন।

প্রথমত, অন্যান্য শিল্পে যেরূপ সূক্ষ্ম, গভীর ইঙ্গিত ও আবেদন থাকে সিনেমার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উপাদান আছে কিনা, এবং থাকলেও তার সাফল্য ও কার্যকারিতা সম্ভব কিনা। যদি, আপাতত আমরা স্বীকার করে' নিই যে আর্ট মাত্রই উদ্দেশ্যমূলক —মাত্রার কথা অবশ্য পরে বিচার্য—তাহ'লে হয়তো এ-প্রশ্নের একটা মোটামুটি মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব হবে। সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি শিল্পে যে অশরীরী ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিচিত্র লীলা প্রকটিত হয়, সিনেমার এলাকায় তা' কি কারণে অনুপস্থিত বা তার প্রবেশ নিষেধ—এই প্রশ্নের অপক্ষপাত উত্তরই সর্বপ্রথম যুথেষ্ট।

চিরন্তন রসের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা ও গভীরতার দাবীই সর্বাগ্রে। এই সূক্ষ্মতা ও গভীরতার সর্ববিধ দাবী মিটিয়ে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য যদি তার আপন সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয়, বিংশ শতাব্দীর আর্টের কৌলীন্য তা'তে বৃদ্ধি পাবে বৈ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না। তবে, এখানে প্রশ্নটাই একটু বেশি জটিল। কা'রও কা'রও অভিমত সিনেমার আর্ট নাকি একেবারেই যন্ত্রগত, এবং যন্ত্রগত ব'লেই স্থূল উদ্দেশ্য ছাড়া তার দ্বারা আর কিছু সিদ্ধ হ'তে পারে না।

আর্ট কোনো বাঁধা-ধরা নীতি-নিষ্ঠা বা ভ্রান্ত বিশ্বাসের স্তোক-স্তুতিতে কোনো কালেই স্বাস্থ্য সঞ্চয় করেনি—এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এ-ও দেখতে পাই যে শিল্প-বিচারে এক ধরণের সংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ সব দেশেই, সাময়িকভাবে নতুন-কোনো শিল্পের পরিপুষ্টির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনো শিল্পই ব্যর্থ হয়নি—ব্যর্থ হয় না—স্বতন্ত্র উপায় ও আবেদনে, স্বতন্ত্রতর ভঙ্গিতে তা সিদ্ধি ও মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে।

সিদ্ধি ও মুক্তির মুখাপেক্ষী হ'য়েই নতুন কোনো শিল্পের পক্ষে প্রচলিত সংস্কার, সূক্ষ্মতা ও গভীরতার প্রকৃতি পরিবর্তন অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। প্রচলিত উপাদান ও উপকরণের প্রয়োগেও চূড়ান্ত রসোত্তীর্ণতায় যে ত্রুটি র'য়ে গেল, সেই ত্রুটি-পূরণের

প্রতিশ্রুতি নিয়েই সংস্কার-নিরপেক্ষ নতুন শিল্পের জন্ম। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদির মুখ্য উদ্দেশ্য ও ব্যাপক কার্যকারিতায় যে ত্রুটি র'য়ে গেছে, কে জানে, চলচ্চিত্র-শিল্পে সেই ত্রুটি-পূরণের প্রতিশ্রুতি নেই। কে জানে, বিংশ শতকীয় এই যন্ত্রগত আনন্দ জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি নিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠবে না!

চিত্র-পরিচিতি

সম্প্রতি ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার 'অমরগীতি' নামক যে-ছবিখানি 'রূপবাণী' চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে তার গল্পাংশ সম্বন্ধে একটু অবহিত হ'লে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক পট-ভূমিকার প্রাথমিক মোহ সঞ্চারিত হ'তে না হ'তেই একটি অতিসাধারণ প্রেমোপাখ্যান শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে' দর্শক-চিত্তকে আঘাত দেয়। দর্শকের রসগ্রাহী মন একটি বিশেষ অনুপ্রেরণা ও অনুভূতির আওতায় এসে সবে মাত্র কৌতূহল-উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় সুরু হ'ল এমন কতকগুলি ঘটনা যা পরিণতির অপেক্ষা না রেখেই ছবিকে সঙ্গে-সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে এনে সমস্ত সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি টানে। প্রেম এবং আঘাত বাঙলা চলচ্চিত্রের পক্ষে অপরিহার্য হ'লেও কাহিনী-রচয়িতা বৈচিত্রপূর্ণ বিশিষ্ট অনুভূতিটিকে আশ্রয় ক'রেই ছবিখানিতে সত্যি-কারের অপরূপত্ব আরোপ করতে পারতেন ব'লে আমাদের স্থির বিশ্বাস। আশা ছিল, 'অমরগীতি'র গল্পাংশে এমন-কিছু থাকবে যা' নিতান্ত ক্লান্তিকর ও একঘেয়েমির আরুচি থেকে নিষ্কৃতি দেবে।···আরো মুস্কিল এই, বিদেশীয় গল্পকে এ-দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে পর্দায় দাঁড় করাতে হ'লে মেটুকু শক্তি ও সাফাই-এর প্রয়োজন, সেরূপ শক্তিসম্পন্ন কাহিনী-রচয়িতার সংখ্যাও এদেশে বিরল। তবে, এই শ্রেণীর গুণমন্তা এ-দেশের ষ্টুডিয়োতে যত কম আদৃত হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের স্বাস্থ্য ও প্রগতির পক্ষে ততই মঙ্গল।···অভিনয়ের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকলেও, পরিচালনার পরিচ্ছন্নতা ও সূক্ষ্মতার জন্য 'অমরগীতি' অন্তত কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

উৎকৃষ্ট গল্পের সমস্যাকে এড়াবার জন্য বম্বের দু'একটি চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি যে সহজ উপায় উদ্ভাবন ক'রেছে তা সত্যিই অতুলনীয়। এ-ব্যাপারে প্রথম পুরস্কার দিতে হয় বোম্বাই-এর হিন্দুস্থান সিনেটোনকে। শরৎচন্দ্র জীবিত থাকলে দেখতে পেতেন যে 'সৌভাগ্য' চিত্রের কাহিনী-রচয়িতা এম. জি. দাভে তাঁর 'দত্তা' উপন্যাসের মর্যাদা কী উপায়ে সহস্রগুণে বৃদ্ধি ক'রেছেন! বিনা স্বীকৃতিতে, হুবহু অনুকরণের এমন নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত হিন্দুস্থান সিনেটোনের এম. জি. দাভে ছাড়া ইতিপূর্বে আর কেউ

সাবনা বোস

ওয়াদিয়া মুভিটোনের 'আজনবী' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

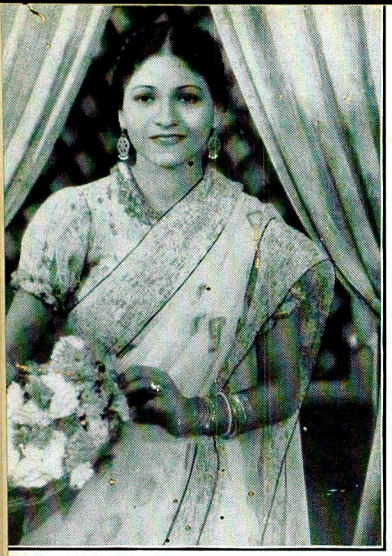

হংস ওয়াদিকার

বম্বে টকীজের 'আজাদ' চিত্রে ইনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

লীলা চিট্‌নিশ

বম্বে টকীজের 'আজাদ' চিত্রে এঁর সাবলীল অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লীলা চিট্‌নিশ

বম্বে টকীজের 'বন্ধন' চিত্র এঁর অভিনয়-নৈপুণ্যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

দিতে পেরেছে কি না আমাদের জানা নেই। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর বিশেষ কোনো অদল-বদল হয় নি, অধিকাংশ স্থলে ডায়ালগ্ পর্যন্ত এক, চরিত্রগুলি সুঁধু আইনের শাসন মনে রেখে নাম পরিবর্তন করেছে মাত্র। অবাক হই এই ভেবে যে, একটি উন্নতিকামী চিত্র-প্রতিষ্ঠান কী করে' এই অনুকরণ-কীর্তিকে প্রশ্রয় দিল।

আরো আশ্চর্য, বম্বে টকীজের মতো সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানও এই অপরাধে অপরাধী। এঁদের নবতম ছবি 'বন্ধন'-এর গল্পাংশের সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। উৎকৃষ্ট কাহিনীর অনটনই যে এর মূল কারণ, এ-কথাই বা কী করে' বিশ্বাস করি! লাভের গুড়ের প্রলোভন ব্যবসাবুদ্ধিহীনতাকে কিরূপ নগ্নভাবে প্রকাশ করে এবং তার পরিণাম যে কতো শোচনীয় তা' অনুধাবন করার মতো চৈতন্য বম্বে টকীজের মতো প্রতিষ্ঠানে আছে আশা করতে পারি—হিমাংশু রায়ের মতো প্রকৃত শিল্পী অন্তত যে-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

ভরসার কথা, এই অপকীর্তির সংক্রামক ব্যাধি বম্বের মিনার্ভা মুভিটোনকে স্পর্শ করতে পারেনি। এই প্রতিষ্ঠানের নবতম ছবি 'ভরসা'র কাহিনীটি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে খানিকটা অভিনব বলা যেতে পারে। গল্পাংশের গভীরতা ও সূক্ষ্ম অভিব্যঞ্জনা ছবিখানিকে সার্থক শিল্প-সৃষ্টির রূপ দান ক'রেছে। আখ্যানবস্তুটি ঘনীভূত ও অতি-গম্ভীর আবহাওয়ার আওতায় থেকেও নাটকীয় রসে পরিপূর্ণ। 'ভরসা'র পরিচালনায় সোরাব মোদীর কৃতিত্বও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জটিল চরিত্র 'রসিক' ও 'শোভা'র ভূমিকায় যথাক্রমে চন্দ্রমোহন ও সর্দার আখ্‌তার প্রশংসনীয় অভিনয় ক'রেছেন। 'ভরসা' নিঃসন্দেহে মিনার্ভা মুভিটোনের সুনাম বৃদ্ধি করবে।

এ-দেশের ষ্টুডিয়ো সংবাদ

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের নবতম বাঙ্‌লা ছবি 'ঠিকাদার' চিত্রা চিত্রগৃহে কয়েকদিন আগে মুক্তিলাভ করেছে। সভ্যতা ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক আত্মপ্রতিষ্ঠ দুঃসাহসী যুবকের জীবনী কেন্দ্র করে' 'ঠিকাদার'-এর কাহিনী গঠিত হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা ক'রেছেন প্রফুল্ল রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, তুলসী লাহিড়ী, রেণুকা রায়, কমলা ঝরিয়া, চিত্রা প্রভৃতি।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া

এঁদের আগামী বাঙ্‌লা ছবি 'প্রতিশোধ'-এর চিত্রগ্রহণ সুশীল মজুমদারের

পরিচালনায় শীঘ্রই আরম্ভ হবে। 'প্রতিশোধ'-এর কাহিনী রচনা ক'রেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র।

এঁদের নবতম হিন্দী ছবি 'কয়েদী' শীঘ্রই ভারতের প্রধান-প্রধান শহরগুলিতে মুক্তিলাভ করবে।

মতিমহল থিয়েটার্স

ফণি বর্মার পরিচালনায় এঁদের 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। 'নিমাই সন্ন্যাস'-সম্পর্কিত যাবতীয় আভ্যন্তরীণ দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বহির্দৃশ্যগুলির কাজ আরম্ভ হ'তেও আর দেরি নেই।

আগামী বর্ষে এঁরা 'দাতাকর্ণ' 'কৈকেয়ী', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্রীরাধা' নাম দিয়ে চারখানি পৌরাণিক চিত্র তুলবেন। এ ছাড়া, কয়েকখানি সামাজিক ছবি তোলার পরিকল্পনাও আছে। সামাজিক ছবির কাহিনী বাঙলার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা থেকেই গ্রহণ করা হবে।

ন্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটর্স

এই প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী বাঙলা ছবি 'বিজয়িনী'র চিত্রগ্রহণ শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়োতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন তুলসী লাহিড়ী।

ওয়াদিয়া মুভিটোন

বম্বের ওয়াদিয়া মুভিটোনের মধু বোস পরিচালিত ত্রিভাষী বাণীচিত্র 'রাজনর্তকী'র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এল। 'রাজনর্তকী'র বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রছেন সাধনা বোস, প্রতিমা দাশগুপ্ত, অহীন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ প্রভৃতি। বাঙলা সংস্করণ শীঘ্রই 'উত্তরা' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী
১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ১২২, বৌবাজার ষ্ট্রীটের 'আর্থিক জগৎ প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ ও পৌষ—১৩৪৭

পূজা

শিল্পী— যামিনী রায়